জাহ্নবী
শ্রীভোলানাথ

গ্রন্থকারের ❋ ❋

❋ অন্যান্য নাটক

বামনাবতার	...	১৲
কালচক্র	...	১॥০
পৃথিবী	...	১॥০
আদিশূর	...	১॥০
নরকাসুর	...	১॥০
দাক্ষিণাত্য	...	১॥০
ধনুর্যজ্ঞ	...	১॥০
পঞ্চনদ	...	১॥০
ছিদ্রকলস	...	॥০
প্রাণে-প্রাণে	...	॥০

Printed by K. P. Nath, at the
Nath Bros, Printing Works.
6, Chaldabagan Lane, Calcutta,

[পৌরাণিক নাটক]

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত।

ভূতপূর্ব্ব মিনার্ভা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক
ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

উদ্বোধন রজনী—

শনিবার, ১৬ই ভাদ্র।

—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—

২৫।৩, তারক চাটার্জ্জীর লেন কলিকাতা।

শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৪৬ সাল।

যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভিনব গ্রন্থ

কামকলা

ডাঃ বি, পাত্র, এম, ডি, পি, এইচ, ডি, এস, সি, (U.S.A) প্রণীত।

যে গোপন কথা নববধূ একান্ত নিভৃতে সহচরীর কাণে কাণে বলিয়া থাকে, যে কথা তরুণ তাহার প্রিয় সহচরের সঙ্গে আলাপ করে, প্রৌঢ় তাহার সমবয়স্কার সঙ্গে অন্যের অশ্রুতস্বরে বলিয়া থাকে, সেই বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয় ?

কিসে জীবন সুখময় হয়, কিসে শরীর সুস্থ ও সবল হয়, কিসে সন্তান সুশ্রী, দীর্ঘায়ু ও ধীসম্পন্ন হয়, কিসে যৌবনের প্রকৃত চরিতার্থতা হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানেন না। অধিকাংশ নর-নারীই একটা বেগবতী প্রবৃত্তির তাড়নায় স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়; তারপর যখন চৈতন্য জন্মে, তখন আর প্রতিকারের উপায় বা সময় থাকে না। সেইজন্য বহু ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া আমরা এই "কামকলা" গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

ইহাতে কি কি বিষয় আছে ?

১। পুরুষ-প্রকৃতি ও সৃষ্টি-তত্ত্ব। ২। যৌবন-নির্ব্বাচন, জীব-জগৎ ও উদ্ভিদ-জগতের দৃষ্টান্ত। ৩। মানব-প্রকরণ ও পরিণতি। ৪। মানব শরীর সম্বন্ধে আবশ্যকীয় জ্ঞান। ৫। বিবাহ—উহার উদ্দেশ্য ও বয়স। ৬। পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন। ৭। যৌবনচর্চ্চা। ৮। গর্ভপ্রকরণ। ৯। গর্ভকরণে ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ। ১০। গর্ভ নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রণালী। ১১। গর্ভ-প্রতিরোধ। ১২। ইচ্ছামত গর্ভধারণ। ১৩। বন্ধ্যাত্বের কারণ ও তাহার প্রতিকার। ১৪। ইচ্ছামত পুত্র-কন্যা উৎপাদন। ১৫। কিসে সন্তান সবল ও দীর্ঘায়ু হয়। ১৬। সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যোন্নতি। ১৭। কিসে শরীর দীর্ঘকাল সবল ও সক্ষম থাকে। ১৮। রতি ও ধর্ম্মসাধন। ১৯। আদর্শ জীবন। ইহা বাজারের বাজে অশ্লীল গ্রন্থ বা অলীক কথায় পূর্ণ নহে। কাপড়ে বাঁধাই, সুন্দর ত্রিবর্ণ রঞ্জিত প্রচ্ছদপট, কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কুশীলবগণ।

পুরুষ-চরিত্র ঃ

মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, নারায়ণ ও নন্দী।

যোগাচার্য্য	ছদ্মবেশী মহাদেব।
মঙ্গলাচার্য্য	ছদ্মবেশী বিধাতা পুরুষ।
কজ্জল	ছদ্মবেশী নারায়ণ।
বদন	ছদ্মবেশী নন্দী।
সৃঞ্জয়	মঙ্গলাচার্য্যের শিষ্য।
সুহোত্র	প্রতিষ্ঠানাধিপতি।
পুরুমীর	ঐ ভ্রাতা।
জহ্নু	সুহোত্রের পুত্র।
সংকল্প	পুরুমীরের পুত্র।
কনক	তরলার পুত্র।
সঙ্কর্ষণ	তরলার স্বামী।
চৈতন্য	পুরুমীরের বয়স্য।

যুবনাশ্ব-চর, অনুচরগণ, দেবতাগণ, শিষ্যগণ।

নারী-চরিত্র ঃ

গঙ্গা ও ভক্তি।

কাবেরী	গঙ্গা অংশজা। আজমীর-রাজকন্যা।
কেশিনী	সুহোত্র-মহিষী।
তরলা	সংঙ্কর্ষণের স্ত্রী। পুরুমীরের রক্ষিতা।
খড়্গেশ্বরী	চৈতন্যের স্ত্রী।

গঙ্গাসঙ্গিনীগণ, তরঙ্গবালাগণ, অপ্সরাগণ, সহচরীগণ।

নবীন নাট্যরথী—শ্রীগোবর্দ্ধন শীল প্রণীত

বিদর্ভ-নন্দিনী

[সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হইতেছে]

লক্ষ্মী অংশে বিদর্ভরাজ ভীষ্মকদুহিতা রূপে রুক্মিণীর জন্ম গ্রহণ। ধরণীর পাপভার মোচনার্থ নারায়ণের শ্রীকৃষ্ণ অবতার। ভীষ্মক-রাজ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ সহ রুক্মিণীর বিবাহ উদ্যোগ ও কৃষ্ণদ্বেষী ভীষ্মক-রাজপুত্র রুক্মের বিদ্বেষ ভাব ও বিবাহে বাধা দিবার জন্য শিশুপালের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্র। রুক্মিণী সহ শ্রীকৃষ্ণের পরিণয়। ধর্ম্মপ্রাণ কঙ্কন ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বার্থপর কন্দর্প কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা। রুক্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্মচ্যুত কঙ্কনপত্নী কল্যাণীর মর্ম্মন্তুদ বিলাপ। রুক্ম-ভ্রাতা নন্দনের অপূর্ব্ব পিতৃ-ভক্তি। শঙ্খনিধি, ছন্দ, দুলালী, মুখরা প্রভৃতি সমস্ত চরিত্রই অনবদ্য অভিনব—নবসৃষ্টি মাধুর্য্যে মণ্ডিত। কোনরূপ চরিত্র বাহুল্য না থাকায় অতি অল্প লোকেই অভিনয় করা চলে। মূল্য ১॥০ টাকা।

সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দৈত্যপতি প্রহ্লাদের স্বর্গ-বিজয়, ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানপতি রজির সহযোগে দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে সমর অভিযান। প্রহ্লাদের পরাজয়। ইন্দ্র কর্ত্তৃক মহারাজ রজিকে ইন্দ্রত্ব দানের প্রতিশ্রুতি ও পরে ইন্দ্র কর্ত্তৃক মহারাজ রজির জীবন নাশ। ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্তের অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি, রজি ভ্রাতা কম্বু ও পুত্রগণ কর্ত্তৃক স্বর্গ আক্রমণ। ইন্দ্রের পরাজয় ও ইন্দ্রের তপস্যা পরে বৃহস্পতি কর্ত্তৃক বরলাভ। ইন্দ্রের স্বর্গ আক্রমণ ও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার অল্প লোকে সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সংগঠনকারীগণ

স্বত্বাধিকারী	শ্রীযুক্ত সলিল কুমার মিত্র বি,কম্
প্রযোজক	„ কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস, সি
সঙ্গীতাচার্য্য	„ সুর-সুন্দর কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
মঞ্চ শিল্পী	„ পরেশনাথ বসু (পটল বাবু)
অভিনয় পরিচালক	„ বিমল চন্দ্র ঘোষ
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	„ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ

মহাদেব	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মহাবিষ্ণু	„ উমাপদ বসু
ইন্দ্র	„ বিমল ঘোষ (২নং)
ব্রহ্মা	„ সন্তোষ ঘটক
নন্দী (বদন)	„ গোপাল ভট্টাচার্য্য
সুহোত্র	„ জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
	„ জীবন গঙ্গোপাধ্যায়
পুরুমীর	„ প্রফুল্ল দাস (হাজু বাবু)
সংকল্প	„ সুশীল ঘোষ্
সঙ্কর্ষণ	„ বঙ্কিম দত্ত
মঙ্গলাচার্য্য	„ মহাদেব পাল
সৃঞ্জয়	„ রবীন্দ্র রায় চৌধুরী
চৈতন্য	„ রঞ্জিৎ রায়
যুবনাশ্ব-চর	„ বিষ্ণু চরণ সেন
	কুমারী টুনীরাণী
কনক	„ আশালতা
গঙ্গা	মিস্ লাইট্
ভক্তি	সুগায়িকা দুর্গারাণী
কাবেরী	শ্রীমতী তারকবালা
কেশিনী	„ রাণীবালা
তরলা	„ সরযূবালা
খড়্গেশ্বরী	„ রাজলক্ষ্মী (খেঁদী)

———

যাঁর প্রতিভালোকে নাট্যাকাশ প্রভা-প্রোজ্জ্বল—যাঁর নাট্যগ্রন্থ
সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সর্ব্ব সম্প্রদায়ে অভিনীত—
সেই সর্ব্বজনপ্রিয় নাট্যকলাবিদ্—
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

অভিনেতৃগণের অভাব মোচন করিতে প্রচারিত হইল। মানুষের সকল সমস্যার সমাধান করে—ভুলকে নির্ভুল করে যেমন অভিধান—সেইরূপ অভিনেতৃবর্গের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিবে—সংশয়ের অবসান করিবে এই—

আধুনিক অভিনয় শিক্ষা

কোন্ রস—কি ভাবে পরিস্ফুট করিতে হয়—কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ ভাব ভঙ্গীর প্রয়োজন হয়—কোন্ স্থলে কেমন করে অন্তর্নিহিত ভাব-ধারার বিকাশ করিতে হয়—তাহার একত্র সমন্বয়ে সঙ্কলিত এই—

আধুনিক অভিনয় শিক্ষা

মহাদেব কেন নটরাজ—শ্রীকৃষ্ণ কেন নটবর নামে অভিহিত—নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তির পৌরাণিক আখ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের অভিনয় পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত আছে—এই আধুনিক অভিনয় শিক্ষা পুস্তকে। আর আছে ভারতীয় নৃত্যাভিনয় শিক্ষার অনেক কিছু। শুধু তাই নয়—তার সঙ্গে আছে নাট্যাভিনয়ের নব রসের—ও নৃত্যাভিনয়ের ষড় ঋতুর বহু ভাবযুক্ত চিত্র এবং নৃত্যের নয়নাভিরাম চিত্র বহু বর্ণের—বহু রকমের। একাধারে এই আধুনিক অভিনয় শিক্ষা পুস্তক অভিনেতৃবর্গের নাট্য-অভিধান ও দর্পণ। সকলের সুবিধার্থে ও বহুল প্রচারার্থে এই বহু চিত্র যুক্ত—বহু মূল্য গ্রন্থের মূল্য সাময়িক ভাবে মাত্র—৷৹ আনা করা হইল।

জাহ্নবী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

প্রভাত-সূর্য্য পূর্ব্বাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইতেছিল, স্নানার্থিনীগণ স্নান শেষে বন্দনা গাহিল

গীত।

দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে,
ত্রিভুবন তারিণি তরল তরঙ্গে।
শঙ্কর মৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদ কমলে॥
ইন্দ্র মুকুটমণি রাজিত চরণে, সুখদে শুভদে সেবক শরণে।
রোগং শোকং তাপং পাপং, হরমে ভগবতি কুমতি কলাপম্॥
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে।
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরুময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে॥

[গীতশেষে সকলের প্রস্থান]

মঙ্গলাচার্য্য ও সৃঞ্জয়ের প্রবেশ।

মঙ্গলাচার্য্য। তোমার জীবনের সুপ্রভাত সৃঞ্জয়!

সৃঞ্জয়। সুপ্রভাত!

মঙ্গলাচার্য্য। হাঁ, এই শুভমুহূর্ত্তে অগ্রে তোমার মাতাকে প্রণাম কর।

সৃঞ্জয়। [সবিস্ময়ে] আমার মা?

মঙ্গলাচার্য্য। তোমার মা বিশ্বতারিণী গঙ্গা।

সৃঞ্জয়। আমার মা বিশ্বতারিণী গঙ্গা?

মঙ্গলাচার্য্য। যদিও গর্ভধারিণী নন, তাহলেও জীবন-দায়িনী—পালন-কারিণী—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী।

সৃঞ্জয়। কৌতুহল মার্জ্জনা করুন আচার্য্যদেব যদি জানেন ত বলুন আমি কে?

মঙ্গলাচার্য্য। তা বলতে পারবো না। তবে একদিন নিশীথে এক ধাত্রী একটী সদ্যোজাত শিশুসহ গঙ্গাতীরে—বেণীমাধবতীর্থে উপস্থিত হয়, আমি তখন বেণীমাধব দর্শনে প্রয়াগে, আকণ্ঠ গঙ্গাজলে মজ্জমান। আহ্নিক সমাপ্তে দেখি ধাত্রী নাই, কিন্তু নদীস্রোতে তার ক্রোড়স্থ শিশুশায়িত; রক্ষা করতে ছুটে গেলাম, দেখলাম অপূর্ব্ব দৃশ্য! স্নেহভারাবনতা দেহা—করুণায়তা নয়না—সর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী মা সেই আসন্ন মৃত্যু মুখে পতিত শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। মাতৃ-চরণে প্রণাম করলাম। সেই হতে তার রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা ও সংস্কারের বোঝা নিয়ে আসছি; আর সেই নিরাশ্রয় শিশু সৃঞ্জয় তুমি।

সৃঞ্জয়। তা হলে আমার জন্মস্থান প্রয়াগ?

মঙ্গলাচার্য্য। হতে পারে!

সৃঞ্জয়। পিতা মাতা?

মঙ্গলাচার্য্য। বলবার উপায় নেই।

সৃঞ্জয়। কি দুর্ভাগ্য আমার আচার্য্য। সংসারে পরিচয় বিহীন—না—না—পরিচয় বিহীন কেন এই তো পরিচয়ের আভাস পেয়েছি! প্রয়াগ আমার জন্মভূমি! আচার্য্যদেব! আপনি অনুমতি দিন, আমি প্রয়াগ দর্শনে যাব—সত্যই আজ আমার সুপ্রভাত!

[প্রণাম করিয়া প্রস্থানোদ্যত]

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। দাঁড়াও।

মঙ্গলাচার্য্য। কে মা?

সৃঞ্জয়। মা। সর্ব্বসন্তাপ-বিনাশিনী, শান্তিরূপা সুখময়ী মা!

গঙ্গা। হাঁ, আমি মা, তবে এ মা আর সে মা নয়। এ মা এখন বিষাদময়ী।

সৃঞ্জয়। বিষাদময়ী! ত্রিভুবন-সঞ্জীবনী মা গঙ্গা আজ বিষাদময়ী!

গঙ্গা। আশ্চর্য্য হবার এতে কিছু নাই বৎস! ঘটনাচক্রে আজ দেবাদিদেব শঙ্করের সঙ্গে আমার বিবাদ!

সৃঞ্জয়। সে কি মা?

গঙ্গা। সে অনেক কথা, যথা সময়ে জানতে পারবে। আজ শুধু এই টুকু জেনে রাখ—প্রতিষ্ঠানের যুবরাজ জহ্নু শিব-বরে চির ব্রহ্মচারী, শিব অংশে জন্ম তার, আজন্ম বৈরাগ্যভাবাপন্ন সে—তা'কে সংসারী কর্ব্বার জন্য কোন উপায় না দেখে প্রতিষ্ঠানপতি মহারাজ সুহোত্র দীর্ঘকাল আমার আরাধনা করেন। তাঁর অর্চ্চনায় আত্মহারা হয়ে তাঁকে আমি অভীষ্ট বর প্রদান করি ও নিজ অংশে কন্যা কাবেরীকে সৃষ্টি করে তার

সঙ্গে জহ্নুর বিবাহ স্থির করি। সব ঠিক—বিবাহ হয়—হয়—এমন সময়ে হঠাৎ কাবেরী দৈবী মায়ায় অন্তর্হিতা!

সৃঞ্জয়। এ যে অদ্ভুত ঘটনা মা।

গঙ্গা। দেবাদিদেব শঙ্করের মায়া এ; কিন্তু আমি এর প্রতিবিধান কর্ব্বো।

সৃঞ্জয়। মা।

গঙ্গা। সৃঞ্জয়, তুমি প্রয়াগে যাচ্ছ কিন্তু তৎপূর্ব্বে তুমি আমার একটী কাজ কর্ব্বে?

সৃঞ্জয়। নিশ্চয় মা—

গঙ্গা। বেশ—তুমি ঐ বৃক্ষতলে অপেক্ষা কর, যথা সময়ে আমার সাক্ষাৎ পাবে।

সৃঞ্জয়। যথা আজ্ঞা মাতা।

[প্রস্থান]

মঙ্গলাচার্য্য। মাগো তোর সনে শঙ্করের বাদ!
কি হবে উপায়?
সৃষ্টি কি গো যাবে রসাতলে?

গঙ্গা। যাঁর সৃষ্টি রক্ষিবেন তিনি
তুমি আমি চিন্তি অকারণ!
অশুভ হইতে শুভের প্রকাশ
নহে তো নূতন
চিরন্তন নীতি এ স্রষ্টার।

মঙ্গলাচার্য্য। প্রণাম চরণে মাতঃ সর্ব্বশুভ প্রদায়িনী।

[প্রস্থান]

গঙ্গা। ফিরায়ে সৃষ্টির নিয়ম শৃঙ্খলা—

অনন্ত সংসার চক্র গর্ব্বে ব্যর্থ করি,
চলেছি অস্থির বেগে উন্মত্ত অন্তরে।
যায় যাবে ভাসিয়া মেদিনী,
হই হব চির-কলঙ্কিনী,
উঠুক ভুবনময় প্রলয়ের প্রতিধ্বনি।
ভক্তরে করিব রক্ষা
নাহি কোন ভয়—

গঙ্গা প্রস্থানোদ্যতা, সহসা মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। ধীরে গঙ্গা—একটু ধীরে!

গঙ্গা। কে, গঙ্গাধর?

মহাদেব। আর গঙ্গাধর বলে বিদ্রূপ কেন? গঙ্গাকে কি আর ধরবার উপায় আছে?

গঙ্গা। সত্যই গঙ্গাকে আর ধরবার উপায় নাই। গঙ্গা এখন দুষ্ট জন্তু-সমাকুলা মূর্ত্তিমতী হিংসা।

মহাদেব। কিন্তু সে হিংসার পরিণাম কি বুঝতে পারছো?

গঙ্গা। পরিণাম—হয়ত প্রবাহিনীর চির লোপ।

মহাদেব। তবে আগে হতে একটু ভেবে চলা ঠিক নয় কি?

গঙ্গা। ভাবিবার দিন
বহুদিন চলিয়া গিয়াছে দেব!
এবে কর্ম্মের সময়।

মহাদেব। হিংসার তুমুল রণ
হৃদয় ক্ষেত্রেতে তব
চলিতেছে দিবস যামিনী।

সাবধান প্রবাহিনী !
হবে চূর্ণ কালের গদায়।
এখনও উপায় আছে
তাই কহি ফেরো—
ফিরে চল সুধীর প্রবাহে।

গঙ্গা। চলেছি উদ্দাম বেগে,
ফিরিবার নাহি শক্তি দেব !
পণ মোর ভক্তরে করিব রক্ষা।
হয় যদি বাক্য রক্ষা মোর
থাকে যদি বরের সম্মান,
তবেই থাকিব বিশ্বে,
নতুবা তটিনী সনে মেদিনী মরুভূ।

মহাদেব। এ দুরাশা,—কভু তব পূরিবার নহে গঙ্গা !
ভক্ত লয়ে শঙ্করের সনে কর বাদ ?
ব্যর্থ হবে চেষ্টা তব ;
সংসার বন্ধনে জহ্নুরে
বাঁধিতে তুমি নারিবে কথনো !
বিষ্ণুপাদোদক তুমি প্রেমপ্রবাহিনী,
ধরেছে আদরে ব্রহ্মা কমণ্ডলু পাতি,
দেবেশ শঙ্কর আমি
দিয়াছি মস্তকে স্থান,
এ হতে সম্মান—হেন উচ্চাসন—
কারো ভাগ্যে ঘটেনি কথন।
আর কি শ্রেষ্ঠত্ব কর আকিঞ্চন ?

গঙ্গা। ত্রিলোচন! করেছি মনন—
জান তো সকলি তুমি,
কেন আর বাড়াও বেদন?
যাচি না নন্দন সুখ
চাহি না অমিয় প্রীতি,
ভাবি না পার্থিব কারো স্নেহ ভালবাসা।
আশা মাত্র এই,
দেখাব গঙ্গার দয়া,
করিব প্রয়াগ রক্ষা
সংসার বন্ধনে বাঁধিব জাহ্নুরে।

মহাদেব। ভুল করেছ গঙ্গা! তুমি কি জানতে না, শিববাক্যে সে ব্রহ্মচারী—চির উদাসীন—সংসারে স্পৃহাশূন্য সন্ন্যাসী। জীবনে সে নারী মুখ দর্শন করবে না।

গঙ্গা। জানতাম, কিন্তু তার পিতার ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিতে, তার অব্যক্ত কাকুতিতে, ভাষাহীন দীর্ঘশ্বাসে মুহূর্তের জন্য আমি সব ভুলেছিলাম।

মহাদেব। বেশ করেছ; তবে এইবার এ প্রস্তাবটাও চিরদিনের জন্য ভুলে যাও।

গঙ্গা। তা পারবো না; আমি যে তাকে অভয় দিয়েছি দেব।

মহাদেব। তবে কি শিববাক্য মূল্যহীন? তুমি তাকে ব্যর্থ করতে চাও?

গঙ্গা। অপরাধ করেছি। শিববাক্য ব্যর্থ করার যা দণ্ড, আমায় দাও।

মহাদেব। সে ঔদ্ধত্যের প্রতিফল একদিন প্রকৃতির বিচারে পাবেই। উপস্থিত সাবধান করি, এ পথে পদার্পণ করো না গঙ্গা! পুণ্যময়

ভারতবর্ষে তাকে দিয়ে আমি ব্রহ্মচারীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমার সঙ্কল্পে বাধা দিও না!

গঙ্গা। তবে আমার প্রার্থনা নিষ্ফল?

মহাদেব। সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

গঙ্গা। ওঃ! এ হেন কঠিন তুমি দয়াধার!
যাক—
উপায় ক'রেছ কিছু প্রতিজ্ঞা রক্ষার?

মহাদেব। গঙ্গাদর্প চূর্ণ হেতু,
জাহ্নুরূপে জেনো আমি অবতার।

গঙ্গা। তুমিও কি জান না শঙ্কর!
দেখাতে গঙ্গার শক্তি,
কাবেরী মূর্ত্তিতে আমি বিহরি ধরায়?

মহাদেব। কোথায় কাবেরী তব পেয়েছ সন্ধান?

গঙ্গা। জলে থাক—স্থলে থাক—অনল-অনিলে,
ভূগর্ভে—ত্রিদিবে কিম্বা গ্রহচক্রে,
যথা থাক—গঙ্গা যাবে তথা।

মহাদেব। পবনের সাধ্য নাই পশিতে সে গণ্ডী মাঝে—

গঙ্গা। ধরিও না অপরাধ তবে।

[প্রস্থানোদ্যতা]

মহাদেব। কোথা যাও—কোথা যাও গঙ্গা?

গঙ্গা। [ফিরিয়া] ছুটিব উল্লাসে তব চূর্ণি সব বাধা।
গঙ্গা আজ লক্ষ্যহীন—ভীম ধূমকেতু,
গঙ্গা আজ সৃষ্টির বিস্ময়।

[প্রস্থান]

মহাদেব।　　অদ্ভুত সাহস তব,
বাখানি তোমারে গঙ্গা—
বাদ কর শঙ্করের সনে !
কিন্তু ভাবিও না মনে,
জহ্নু সনে কাবেরীর করিয়া মিলন
চূর্ণিবে শিবের দর্প !
এ বিবাহ হইবার নয়।

ব্যস্তভাবে নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। আর বাবা ! হবার তো নয় ঠিক দিয়ে বসে আছ, ওদিকে যে বিয়ের শাঁক বেজে উঠলো ! খবর রেখেছ ?

মহাদেব। ব্যাপার কি নন্দী ?

নন্দী। আর নন্দী ! নন্দীর সব ফন্দী উল্টে গেছে ; মেয়েটা পালিয়েছে।

মহাদেব। [আশ্চর্য্যে] পালিয়েছে ! মেয়েটা পালিয়েছে ! কোন্ মেয়েটা ?

নন্দী। আবার কটা মেয়ে তোমার ঝুলি উপ্ছে পড়ছিল, তাই কোন্ মেয়েটা ? সে দিন যেটাকে চুরি করে এনেছিলুম, সেইটেই।

মহাদেব। বলিস্ কি ? জটিল পার্ব্বত্য পথ, অভেদ্য গুহা, ঐরাবত—গর্ব্ব-খর্ব্বকারী দৃঢ় প্রস্তর-দ্বার, তার মধ্য হ'তে চলে গেল ! তোরা কি সতর্ক থাকিস্ নাই ?

নন্দী। সতর্ক থেকে আর কি হবে বাবা ? ঐ চোখে মাত্র দেখলুম ! পাও এগুলো না, মুখে একটা কথাও সরলো না, দেখতে না দেখতে কাজ সাবাড়। ধুলো পড়া দিয়ে নিয়ে চলে গেল।

মহাদেব। নিয়ে চলে গেল! কে নিয়ে চলে গেল?

নন্দী। কে তার কে জানে বাবা! একটা নদী কোন্ দিক হতে কল কল করে এসে গুহার দ্বারে লাগলো, ফিরে দেখি দুটো নদী দুদিকে বেরিয়ে চলে গেল। তাড়াতাড়ি গিয়ে গুহার দরজা খুলে দেখি, লম্বা চম্পট! সব ফাঁকা, কেবল জল—কেবল জল।

মহাদেব। গঙ্গা—গঙ্গা; গঙ্গাই গুহামধ্যে প্রবেশ করে কাবেরীকেও নদীমূর্ত্তি দিয়ে মুক্ত করে নিয়ে গেছে! তাই যদি হয়—যদি কেন—ঠিক! নন্দী! আর দেরী করিস্ না—ত্রিশূল নে, নদীর পশ্চাদ্গামী হ' তার স্রোত উল্টে দে।

নন্দী। না বাবা! ও মেয়ে-মানুষের কারবারে আমি আর হাত দিচ্ছি না; তাল সামলাতে পারবো না। একটা জল-জ্যান্ত তাজা হাত পা-ওয়ালা লোক, সে কিনা জল হয়ে বেরিয়ে চলে গেল! এ কোন্ দেশী জানোয়ার বাবা!

মহাদেব। তাই তো! এখন উপায়?—

নন্দী। উপায় আবার কি! এতো দিব্যি শোধ বোধ হয়ে গেছে। আমরা যেমনি মেঘ হয়ে মেয়ে চুরি করেছিনু, তারাও তেমনি জল হয়ে কাটান দিলে—বাস্ মিটে গেল। এর ওপর আর চাপান চলে না।

মহাদেব। আশ্চর্য্য! একটা স্ত্রীলোককে এঁটে উঠতে পারলাম না!

নন্দী। ঐ তো বাবা! ঐ খানটায় হাসিয়ে দিলে। ও বেটীর জাতকে এঁটে ওঠা কি তোমার মত বৈরাগীর কর্ম্ম! ওর ঝড় ঝাপটায় কত ধৈর্য্যের চালা উড়ে গেছে—ধর্ম্মের কোটা ভেঙ্গে গেছে—পুণ্যের জাহাজ ডুবি হয়েছে। তোমার মত তালি দেওয়া পান্‌সী যে এখনও কিনারা ধরে আছে, এই আশ্চর্য্য! নাও, ও সব লুকোচুরির ব্যাপারে আর কাজ নাই, কোন্ দিন তুমি পর্য্যন্ত চুরি হয়ে যাবে কি?

নন্দী।　　　না নন্দী!
　　　　　অসহ্য এ গঙ্গার ধৃষ্টতা,
　　　　　রক্ত-চক্ষে শ্রেষ্ঠ হ'তে চায়!
　　　　　মাথায় ধরেছি ব'লে এত অহঙ্কার!
　　　　　লঘুগুরু নাহি জ্ঞান!
　　　　　ভেবেছে ঈশান
　　　　　নীরব শ্মশানচারী—
　　　　　জটাধারী—বিভূতি লেপন,
　　　　　করিতে দমন কি শকতি তার?
　　　　　জানে না যে গর্জ্জিলে ত্রিশূল,
　　　　　রবে না সৃষ্টির মূল,
　　　　　হবে বিশ্ব স্তিমিত নয়ন।

নন্দী। তা' তো বুঝলুম! তবে এইবার কি মতলব ঠাওরাচ্ছ—বল দেখি? ও মেয়ে-মানুষ নিয়ে কিন্তু আর কাজ মিট্‌বে না—মিছে পাকড়া-পাকড়ি হবে।

মহাদেব। তুই একবার যা—ছদ্ম বেশে যা। যেখানে জহ্নু পথভ্রান্ত, হ'য়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল হয়ে পথিকের অন্বেষণ করছে—সেইখানে যা। তুই গিয়ে তাকে আমার আশ্রমে নিয়ে আয়। তার দ্বারাই যখন শিক্ষা দিতে হবে, তখন তাকেই আগে তৈরী করা দরকার। যা; বিলম্ব করিস্ না, এ বিবাহ হতে দেওয়া হবে না।

[প্রস্থান]

নন্দী। নাও—এইবার সুতোর গোল ঘোচাতে বুঝি বা মাকু সাবাড় হয়।

[প্রস্থান]

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মঙ্গলাচার্য্যের আশ্রম পার্শ্ব।

মঙ্গলাচার্য্য ও কমণ্ডলু হস্তে সৃঞ্জয়ের প্রবেশ।

মঙ্গলাচার্য্য। কে সৃঞ্জয়! তুমি ফিরলে যে?

সৃঞ্জয়। শুধু শুধু ফিরি নাই আচার্য্য! মায়ের আদেশে, মা এই এক কমণ্ডলু জল আপনাকে দেবার জন্য আমায় দিয়ে গেলেন—আর বলে দিলেন, এ জল যেন বিশেষ যত্নে সাবধানে রাখা হয়।

মঙ্গলাচার্য্য। বটে! বটে! মা স্বয়ং দিয়ে গেলেন? সাবধানে রাখ্‌তে বললেন? দেখি দেখি! [আগ্রহ সহকারে কমণ্ডলুর জল দেখিয়া] তাইতো, এতো গঙ্গাজল নয়! ওঃ—এযে কাবেরী—ঠিক! নারায়ণ! কি তোমার ইঙ্গিত? আমাকে নিয়েও খেলা খেলতে চাও! যাও সৃঞ্জয় তোমার ছুটী!

সৃঞ্জয়। প্রণাম গুরুদেব!

[প্রস্থান]

মঙ্গলাচার্য্য। গঙ্গাসহ শঙ্করের বাদ,
তার মাঝে আমি হইনু জড়িত!
কি করি এখন আমি!
যোগ দিলে শম্ভু সনে,
অভিমানে জননী আমার
ব'বে না জীবন-ভার,
গর্জ্জিলে শিবের শূল,
জ্বলিবে প্রলয় বহ্নি;
ভাবিয়া না পাই,

কোন দিকে দাঁড়াই এখন !
নারায়ণ ! নারায়ণ !
বলে দাও কি তব ইঙ্গিত !
ভেসে যাই সে ইঙ্গিত স্রোতে !

দ্রুতপদে কজ্জলের প্রবেশ।

কজ্জল। কে গা তুমি দাঁড়িয়ে ?

মঙ্গলাচার্য্য। [স্বগতঃ] কে এ ? [প্রকাশ্যে] কে তুমি কমনীয় শিশু ?

কজ্জল। ওকি ! আমার দিকে অমন কট্‌মট্‌ করে তাকাচ্ছ কেন ? এ দিকে একটা অন্ধ লোক গেল, দেখলে ?

মঙ্গলাচায্য। তুমি কে বালক ?

কজ্জল। নাও, এতক্ষণের পর বুঝি এই প্রশ্ন খুঁজে পেলে ?

মঙ্গলাচার্য্য। সত্যই বালক ! আমি এতক্ষণ প্রশ্ন কর্ব্বার সুযোগ পাই নাই ; তোমায় দেখে আমি আপনাকে হারিয়েছিলাম।

কজ্জল। কেন ?

মঙ্গলাচার্য্য। তোমার ঐ রবিকর-প্রোদ্ভিন্ন মুখ-পদ্মখানি দেখে, তোমার ঐ বিজলীচ্ছটা বিস্ফুরিত ঢল-ঢল সজল-জলদরুচি শ্যাম-সৌন্দর্য্য দেখে। বল দেখি বালক কে তুমি ?

কজ্জল। আগে বল দেখি—তুমি কে ?

মঙ্গলাচার্য্য। আমি ! তাইতো, ভাবিয়ে তুললে যে ! আমি হীরক খচিত মহাশূন্যের একটী নক্ষত্র, দিগন্ত বিস্তৃত মরুভুমির একটী বালুকণা।

কজ্জল। তবে আর আমায় ঠাওরাতে পারলে না ? আমিও ঐ মহাশূন্যের বায়ুস্তর—মরুভূমির মরীচিকা। তুমিও যা, আমিও তাই, কেবল

আকারভেদ, শুধু একটা অন্ধকারে তোমায় আমায় পৃথক করে রেখেছে বৈ তো নয়! নিজেকে চেন, আমাকেও চিনবে—জগৎকে চিনবে। যাক্ এখন এদিকে একটা অন্ধলোক গেল, দেখলে?

মঙ্গলাচার্য্য। অন্ধ তো সবাই।

কজ্জল। নাও, আবার শিবের গীত এনে ফেল্‌লে! বল না, দেখ্‌লে না কি?

মঙ্গলাচার্য্য। অন্ধটী তোমার কে?

কজ্জল। কে আবার! কার কে হয়? অন্ধটী আমার অন্ধ, মিছে সম্বন্ধ গোছাও কেন?

মঙ্গলাচার্য্য। অন্ধটীতে তোমার প্রয়োজন?

কজ্জল। বাঃ, অন্ধে প্রয়োজন হবে না, দুর্ব্বলে প্রয়োজন হবে না, দীন দরিদ্রে প্রয়োজন হবে না, তো হবে কিসে? মানুষ কি এত নীচেয় পড়ে গেছে যে, অন্ধের হাত না ধরে লুব্ধদৃষ্টির পথ দেখাবে? দুর্ব্বলে সাহস না দিয়ে রক্ত চক্ষের পক্ষ নেবে? যাক্, তুমি বল্‌বে না—আমিই তবে খুঁজে নেই গে।

[প্রস্থান]

মঙ্গলাচার্য্য। অন্ধের হাত ধরতে তুমি বড় ভালবাস আনন্দময়! তাই বুঝি এ চির ভ্রমান্ধের নিস্প্রভ চক্ষে মেঘাবৃত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির একটা স্ফূরণ দেখালে? তোমার দেওয়া দীক্ষা—তাই লক্ষ্য করে খেল্‌বো। তোমার দেখান পথ—আমি অনন্যমনে চল্‌বো।

[প্রস্থান]

নেপথ্যে জহ্নু ও বদন।

বদন। ঐ একটা আশ্রম পাওয়া গেছে। এত উথলা হলে কি চলে? কে আছ গো ঘরে?

জহ্নু ও বদনের প্রবেশ।

জহ্নু।　　কে আছ মহান!
কে আছ দয়ার ছবি ঈশ্বর প্রেরিত?
তব দ্বারে আমি
বুভুক্ষিত পিপাসিত আতুর অতিথি।
মতিমান্! রাখ প্রাণ,
দাও জল—বিন্দুমাত্র জল।

বদন। আর ফল মূল মিষ্টান্ন কিছু ঘরে থাকে যদি, তাতেও আপত্তি নাই।

মঙ্গলাচার্য্যের প্রবেশ।

মঙ্গলাচার্য্য। কে তোমরা? কোথা হতে আসছ?

বদন। বাপু হে! নেহাৎ চটাচটির যোগাড়ে আছ—বটে? দেবে তুমি এক ঘটী জল, বড় জোর তোমার পুঁজী দুটো হর্ত্তুকী, তাতে এত প্রশ্ন কেন বাপু? কে তোমরা—কোথা বাড়ী—কার সন্তান—কি গোত্র—কি মেল—কেন আমরা কি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি নাকি? না বাপু, আমরা পুকুর খুঁজে নেই গে।

জহ্নু।　　সাধকপ্রবর! শোন পরিচয়,
প্রতিষ্ঠানপতি সুহোত্র-তনয় আমি—
নাম জহ্নু মোর।
ধরিল মোহের ঘোর,
হইনু পশ্চাদগামী বিরাট মায়ার।
এবে ক্ষুধা পিপাসায় হেরি অন্ধকার।
শেষ এই পথিকের অনন্ত কৃপায়
এসেছি আশ্রমে তব।

বদন। বুঝেছ—বুঝতে পেরেছ ? তুমি একটু জল দিতে নানা তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করলে, আর আমি সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে বেচারাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। মানুষ দেখ !

মঙ্গলাচার্য্য। [স্বগত] এই বুঝি নিয়তির খেলা
এই বুঝি প্রকৃতির যোজনা
এই বুঝি ঈশ্বরের অভিপ্রেত ?

[প্রকাশ্যে] ধর এই নির্ম্মল সুবাসিত পানীয়। ঐ দেবমন্দির ! দেবার্চ্চনা ব্যতীত এ আশ্রমে জল গ্রহণ নিষিদ্ধ। যাও, সেখানে ফল, পুষ্প প্রস্তুত আছে ; পূজা দাও, নির্ম্মাল্য নাও, জলপান কর।

[কমণ্ডলু দানান্তে প্রস্থান]

জহ্নু। কোটী নমস্কার সাধনার পথে,
কোটী নমস্কার তপস্বী হৃদয়ে,
কোটী নমস্কার তব দয়ার চরণে।

[প্রস্থান]

বদন। একটু হাত চালিয়ে নেবে বাবাজি ! আমি ততক্ষণ ঐ গাছ-তলাটায় ঘাম মেরে নিই গে।

[প্রস্থান]

দ্রুতপদে জহ্নু ও তৎপশ্চাতে কাবেরীর প্রবেশ।

জহ্নু। তুমি কাবেরী ! কমণ্ডলু মধ্যে তুমি কাবেরী !

কাবেরী। আশ্চর্য্য হলে যুবরাজ !

জহ্নু। আশ্চর্য্যের কথা নয় ? তুমি কাবেরী কমণ্ডলু মধ্যে কি প্রকারে ?

কাবেরী। সে বড় অদ্ভুত রহস্য যুবরাজ ! বিবাহের দিন আমি দৈবী

মায়ায় অপহৃতা হয়ে কেদারনাথ তীর্থে সুদৃঢ় গিরিগুহায় অবরুদ্ধ থাকি। কার শক্তি সেখানে প্রবেশ করে? দস্যুর দল জানে না যে, আমি কাবেরী, গঙ্গা অংশে উদ্ভূতা। দিবসত্রয় অতিবাহিত হওয়ার পর, আমার মা গুহা মধ্যে প্রবেশ করে আমাকেও নদী মূর্ত্তি দিয়ে নিয়ে আসেন। পথি মধ্যে মঙ্গলাচার্য্যের শিষ্য সুঞ্জয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ; মা তার কমণ্ডলু মধ্যে আমায় দিয়ে মঙ্গলাচার্য্যের হাতে পাঠান, তারপর এই সাক্ষাৎ।

জহ্নু। ওঃ! এতটা! [দীর্ঘনিশ্বাস]

কাবেরী। হাঁ এতটা, কেবল তোমার জন্যই এতটা।

জহ্নু। [চমকিয়া স্বগত] আমার জন্য! তুমি কি বলছ! আমি ব্রহ্মচারী।

কাবেরী। কিন্তু তুমিতো আমাকে বিবাহ কর্ব্বার জন্য এসেছিলে?

জহ্নু। না।

কাবেরী। না? সে কি!

জহ্নু। তোমাকে নিতেই এসেছিলাম সত্য কিন্তু সে আমার জন্য নয়, আমি এসেছিলাম আমার পিতৃরাজ্যের কল্যাণে, আমার খুল্লতাত ভ্রাতা সংকল্পের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব বলে!

কাবেরী। সে কি কুমার!

জহ্নু। আমায় বিশ্বাস কর বালা!—

কাবেরী। কিন্তু এখন আর তা হয় না রাজকুমার! তুমি আমায় স্পর্শ করেছ—আমি তোমার। তুমি আমায় গ্রহণ না করলে আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হবো।

জহ্নু। কিন্তু তা কি করে হবে? এ যে ভোগ—এ যে লালসা—এ যে পতনের সুন্দর অথচ ভীষণ মূর্ত্তি।

বদন। [নেপথ্যে] বলি কি হে বাপু! এত দেরী কিসের? জল খাওয়া হলো? [দেবালয়ের মধ্যে দেখিয়া] ও আবার কে বাবা! এ্যাঁ! বাঁকা বাঁকা ঢং, কাঁচা পাকা হাসি, চোখা চোখা চাউনি। এ যে বাবা,— ঠাকুর ঘরেও কুকুর কীর্ত্তন! [দেখিয়া] হুঁ সেই তো বটে! সেই ফলান রং, সেই গলান সোহাগা, সেই চুরি করা ছুঁড়ীটাই তো বটে! যা বাবা, সব লণ্ড ভণ্ড! কাজ একদম খতম! আরে ছ্যাঃ! এতদিন আট্‌কে আট্‌কে শেষটায় হাতে তুলে দিলুম; ঘরে শিকার জুটিয়ে দিয়ে কুনো বেড়ালের মাতুলি করলুম। হায় হায় হায়! বাবা ঠাকুরকে বললুম—এ সব গাঁজাখোরী বুদ্ধির কর্ম্ম নয়—তা শুনলে না। এই যাই, তার গাঁজার কলকে ভাঙ্গবো—সিদ্ধির তোবড়া ছিঁড়বো—ষাঁড়কে ভাগাড়ে দেবো। বাবা জল খেতে এসে একেবারে পুকুর খেয়ে বসে আছে—আরে ছ্যাঃ।

[প্রস্থান]

কাবেরী। কি ভাবছো যুবরাজ?

জহ্নু। ভাবছি—ভাবছি কাবেরী! জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? ভাবছি কাবেরী! মানব-জীবনের সার্থকতা কি—আর ভাবছি কোথায় এলাম!

কাবেরী। এতে আর এত ভাবনার কথা কি? এলে সৌন্দর্য্যের আবাস-ভূমে। চেয়ে দেখ যুবরাজ! কি সুন্দর ঐ আকাশ—যার নীল হৃদয়ে হিরন্ময়ী জ্যোৎস্না ঢলে ঢলে পড়ছে। কি সুন্দর ঐ হিল্লোলিত পবন—আদরে শ্যামা ধরিত্রীকে আলিঙ্গন করছে! কি সুন্দর ঐ পুষ্পকুমারী —ভ্রমর যাকে ঘুরে ঘুরে চুম্বন করছে! বিশ্ব-জগত কি সুন্দর যুবক!

জহ্নু। [মুগ্ধভাবে] কাবেরী! না না কাবেরী, এ সংসার কুৎসিৎ বিষাক্ত—পূতিগন্ধময়। এ সৌন্দর্য্যের মাঝখানেও কি যেন একটা কুৎসিৎ ক্ষত টের পাওয়া যাচ্ছে। তুমি আমায় মুক্তি দাও—মুক্তি দাও—

বিবাহোচিত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানসহ গীতকণ্ঠে
গঙ্গা-সহচরীগণের প্রবেশ।

[সহচরীগণের নৃত্যসহ গীত]

গীত।

ঝেলেছি সাতাস কাটি বরণ করি বর।
উলু উলু শাঁখ বাজালো সঙ্গ মাজায় দিয়ে ভর।
গোপনে কাণে কাণে, বলে দে বিয়ের মানে,
বুকের ভাব চোখের ভাষা পাবে না অভিধানে;
চিনে নাও হাসির টানে নারীরূপের কত দর।

[গীতান্তে প্রস্থান]

জহ্নু। এরা কারা কাবেরী?

কাবেরী। মায়ের সহচরী—আমার ভগ্নী।

জহ্নু। [স্বগত] ওঃ, বন্ধনের কি শৃঙ্খলই আবিষ্কার করেছ দয়াময়! কিন্তু তা হবে না; জহ্নুর শক্তি আছে, সে শৃঙ্খল কাটতে জানে। [প্রকাশ্যে] চল কাবেরী! আমি তোমাকে আমার ভ্রাতার জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাব!

যোগাচার্য্যের প্রবেশ।

যোগাচার্য্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে না—ও কন্যা তুমি আমার হাতে দাও!

জহ্নু। তুমি? কে তুমি সন্ন্যাসী?

যোগাচার্য্য আমিই সেই—যার পুত্র তুমি।

জহ্নু আপনার অঙ্গের কান্তি, চক্ষের দীপ্তি, স্বরের ঝঙ্কার

অমানুষিক ; আপনাকে প্রণাম করি। জিজ্ঞাসা করি, এ সময় এখানে কি জন্য ?

যোগাচার্য্য। মাত্র জানাবার জন্য, যে তুমি সন্ন্যাসীর বরপুত্র, তোমার বিবাহ অনুচিত।

জহ্নু। আমি বিবাহের জন্য আসি নাই সন্ন্যাসী! সংসারে আমি চির উদাসীন, নারীরূপে আমার চির ঘৃণা, ঐশ্বর্য্যে আমার চির-বৈরাগ্য।

যোগাচার্য্য। তবে এসেছ কি জন্য ?

জহ্নু। এসেছি পিতৃরাজ্য প্রতিষ্ঠানের গৌরব রক্ষার জন্য—এসেছি এই নারীকে আমার ভাই সংকল্পের হাতে দিয়ে প্রতিষ্ঠানের রাণী করবো এই উদ্দেশ্যে।

যোগাচার্য্য। তা' মন্দ কথা নয়! তবে রাজা! উপস্থিত এ কন্যা আমার কাছেই থাক ; আমি এর ব্যবস্থা করবো।

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। তোমার ব্যবস্থা—অব্যবস্থা।

যোগাচার্য্য। কে বলে ?

গঙ্গা। আমি বলি।

যোগাচার্য্য। হাঃ হাঃ হাঃ—এখন আর সে কথা খাটে না গঙ্গা-আমি কন্যা নিয়ে চল্‌লুম।

গঙ্গা। রাখতে পার্ব্বে না।

যোগাচার্য্য। রাখতে পার্ব্ব না ? চলে এস বালা আমার আশ্রমে!

কাবেরী। মা ?

গঙ্গা। যাও মা—সতীমন্ত্র তোমায় রক্ষা কর্ব্বে!

কাবেরী। আবার সেই জাল! চল সন্ন্যাসী!

[কাবেরী ও যোগাচার্য্যের প্রস্থান]

গঙ্গা। জহ্নু!

জহ্নু। দেবী!

গঙ্গা। কাবেরীকে গ্রহণ না করে তুমি তার অপমান করলে! তোমাকে তার শাস্তি নিতে হবে!

জহ্নু। কি শাস্তি?

গঙ্গা। সহস্রাধিক সৈন্য নিয়ে কাবেরীর পিতা মহাবীর যুবনাশ্ব তোমায় বন্দী করতে আসছেন! আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।

জহ্নু। কোনও চিন্তা নাই—আমি একাই দ্বিসহস্র!

গঙ্গা। বেশ, তবে শক্তি পরীক্ষাতেই এ যুদ্ধের মীমাংসা হোক।

জহ্নু। আমি প্রস্তুত! চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

পার্ব্বত্যপথ।

যোগাচার্য্য, কাবেরী ও বদনের প্রবেশ।

যোগাচার্য্য। বদন! আসছিস্?

বদন। যাচ্ছি বলে যাচ্ছি, একেবারে শূল খাড়া করে। একটু এদিক ওদিক করলেই আর কি!

যোগাচার্য্য। কেমন—এইবার হয়েছে কি না?

বদন। এ না হলে আর রক্ষে ছিল বাবা? তোমার ও ধুতরো, গাঁজা দেশ থেকে তাড়াতুম।

যোগাচার্য্য। আস্‌ছ মা?

কাবেরী। যাচ্ছি বাবা! চলুন।

যোগাচার্য্য। [গঙ্গার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বগত] আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা এই গঙ্গার! তপোবনে কামনার ঢেউ বহাতে চায়; বিশ্ব সৌন্দর্য্যের উপর হিংসার আগুন জ্বালাতে চায়; ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মচারীর আদর্শ লোপ করতে চায়।

কাবেরী। [স্বগত] ধ্যায়েন্নিত্যম মহেশং রজতগিরিসন্নিভং চারু-চন্দ্রাবতংশং—বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রম ত্রিনেত্রম্।

যোগাচার্য্য। ও কি বালিকা! তুমি ও আবার কি করছো?

কাবেরী। কৈ, কিছুই তো করি নাই।

যোগাচার্য্য। বেশ—বেশ; চলে এস মা! স্বচ্ছন্দে চলে এস, কোন ভাবনা নেই।

কাবেরী। [স্বগত] সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ; রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ; উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।

যোগাচার্য্য। ও কি বালিকা! আবার?

কাবেরী। কৈ, কিছুই না।

যোগাচার্য্য। [সস্নেহে] বেশ—বেশ, চলে এস মা! পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে কি মা? আর বেশী দুর নাই, ঐ আশ্রম দেখা যাচ্ছে।

কাবেরী। [স্বগত] ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোম মূর্ত্তয়ে নমঃ, ইদং সচন্দন বিল্বপত্রং নমঃ—শিবায় নমঃ।

[অঞ্চল হইতে বিল্বপত্র লইয়া মহাদেবের উদ্দেশে অর্পণ]

যোগাচার্য্য। সাবধান বালিকা।

বদন। কি হয়েছে বাবা, কি হয়েছে? মা মনসা চক্র ধরেছে?

যোগাচার্য্য। বেটী শিবায় নমঃ বলে বেলপাতা দিচ্ছে!

বদন। এই মরেছে; বেটী বুদ্ধির থলি ঝেড়েছে—তোমার দফাও সেরেছে।

কাবেরী। নমঃ শিবায় নমঃ [পুনঃ বিল্বপত্র অর্পণ]

যোগাচার্য্য। ঐ শোন্।

বদন। মরুকগে বাবা! তুমি ও সবে চোখ কাণ দিও না।

যোগাচার্য্য। নে—এতে আর চোখ কাণ না দিয়ে থাকা যায়? রাগে আমার মাথা বন্ বন্ করে ঘুরছে—ব্রহ্মাণ্ডটা অন্ধকার দেখছি। এতে চুপ করে থাকা যায়? বদন! বদন! নে বেটীর হাত থেকে বেলপাতা কেড়ে নে তো।

কাবেরী। কি সন্ন্যাসী! কি বল্লে? সন্ন্যাসী তুমি—ত্যাগের প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি—পূজা পদ্ধতির পথ প্রদর্শক তুমি,—তুমি আমার ইষ্ট পূজায় ব্যাঘাত দেবে?

নমঃ শিবায় নমঃ, রুদ্রায় নমঃ, ভূতানাম পতয়ে নমঃ

[বিল্বপত্র অর্পণ]

যোগাচার্য্য। একি—এ আবার কি! কি আশ্চর্য্য! তাই তো!

বদন। আরে, তাই তো কি? একেবারেই মুস্ড়ে গেলে যে! একটা কিছু কর; সব মাটী করলে! বাবা, তোমার চালাকী কেবল বুড়ো ষাঁড়ের ওপর?

কাবেরী। নমঃ শিবায় নমঃ। [বিল্বপত্র অর্পণ]

যোগাচার্য্য। না, আমি আর আমায় ধরে রাখতে পারছি না! প্রেমের স্রোতে হিংসা, দ্বেষ, ছলনা, প্রতারণা দূর-দিগন্তে ভাসিয়ে দিচ্ছে—

ভক্তির ঝঞ্ঝায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কোন্ দিকে উড়িয়ে দিচ্ছে—অর্চ্চনার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে আমার সব জয় করে নিচ্ছে। আমি পরাজিত, কি করি!

[অস্থিরভাবে পাদচারণ]

বদন। ও কি বাবা! এদিক ওদিক করছ কেন?

কাবেরী। নমঃ শিবায় নমঃ [বিল্বপত্র অর্পণ]

যোগাচার্য্য। বদন! দিই বর?

বদন। আরে—আরে—বর দেবে কি!

যোগাচার্য্য। না, ও আমার মাথায় বেলপাতা দিয়েছে।

বদন। তবে তো রাজা করেছে!

যোগাচার্য্য। এ হ'তে আমার রাজ্যপদ কি আছে বদন? দিই বর?

বদন। আরে বাবা একটু চেপে চল না; এর মধ্যেই সব ভুলে গেলে?

যোগাচার্য্য। সব হারিয়ে বসে আছি বদন! পূর্ব্বের সে সঙ্কল্প—সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—সে জাগন্ত প্রতিহিংসা সব গেছে বদন! এখন আমার বলতে যেটুকু আছে—সেটুকু আমার শিবত্ব।

কাবেরী। নমঃ শিবায় নমঃ [বিল্বপত্র অর্পণ]

যোগাচার্য্য। ক্ষান্ত হও বালিকা! বল তুমি কি চাও?

কাবেরী। আমি নির্ব্বিরোধে শিব-পূজা করতে চাই।

যোগাচার্য্য। তুমি সিদ্ধ হয়েছ মা! বল, কি বর চাও?

কাবেরী। তুমি কে সন্ন্যাসী?

যোগাচার্য্য। [স্বগত] না, আর ছলনা করবো না। ভক্তের কাছে প্রতারণা থাটে না [ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া] এই দেখ মা! আমিই তোমার উপাস্য।

কাবেরী। [জানু পাতিয়া করযোড়ে] নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। দাসীর প্রণাম গ্রহণ কর দেব! [প্রণাম করিল]

গীতকণ্ঠে গঙ্গাসঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

[গঙ্গাসঙ্গিনী ও কাবেরীর গীত]

গীত।

কাবেরী।	নমঃ নীলকণ্ঠ
গ-স।	ঢুলু ঢুলু ঢুলু চক্ষু
কাবেরী।	ধবল অঙ্গ,
গ-স।	পিনাকপাণি।
কাবেরী।	নমঃ চির মুক্ত,
গ-স।	সত্যের সাক্ষ্য
কাবেরী।	সৃষ্টিরবক্ষে
গ-স।	মঙ্গল বাণী।
কাবেরী।	তোমাতেই আছ তুমি মিথ্যা সৃজন লয়
গ-স।	তোমাতে বিভীষিকা তোমাতেই বরাভয়,
কাবেরী।	ও চরণ প্রান্তে,
গ-স।	পাতিয়ে অঞ্চল,
কাবেরী।	হইল ধন্যা
গ-স।	ধরণী রাণী।

[গঙ্গাসঙ্গিনীগণের প্রস্থান]

যোগাচার্য্য। বর গ্রহণ কর মা!

কাবেরী। যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাক আশুতোষ, তবে এই বর দাও আমি যেন পুত্রবতী হই।

যোগাচার্য্য। এই কথা মা! হা—হা—হা, এর জন্য এতটা!

বদন। বুঝে সুঝে বর দিও বাবা। বেটীর বিয়ের পাত্তা নাই—একেবারে ছেলের খবর নেয়, এর ভিতর কথা আছে।

যোগাচার্য্য। কথা! এর ভিতর আবার কি কথা থাকবে? আর থাকলেই বা! ও আমার মাথায় বেলপাতা দিয়েছে তো? আচ্ছা মা! তুমি সর্ব্বসুলক্ষণ পুত্র প্রসব করবে। আর কি চাও?

কাবেরী। আর এক প্রার্থনা, আমি যেন দ্বিচারিণী না হই!

যোগাচার্য্য। এত তুচ্ছ ভিক্ষা কেন মা?

কাবেরী। নারীর এ হ'তে উচ্চ ভিক্ষা আর কি হতে পারে বাবা?

যোগাচার্য্য। বেশ। তবে—

বদন। চুপ কর বল্‌ছি—খবরদার! বেটীর ভেঙ্কিতে ভুলো না বল্‌ছি। বুঝতে পারছো না, বেটী মস্ত খেলোয়াড়। ও যখন দ্বিচারিণীর গোড়া বাঁধছে, তখন ও একচারিণী অন্ততঃ আধচারিণীও না হয়েছে কি? সমঝে বাবা! শেষে ফেরে পড়বে।

যোগাচার্য্য। তুই কিছুই বুঝিস না বদন! চুপ করে থাক্। ভক্ত বর চাচ্ছে, আমি বর দাতা—দিতে বসেছি, এর মধ্যেও কৃপণতা করবো? না তা হতে পারে না। শোন মা, শিব-বাক্যে তুমি দ্বিচারিণী হবে না।

কাবেরী। তবে—

যোগাচার্য্য। আর না মা!

কাবেরী। না, এবার আর বর প্রার্থনা করি না। ভিক্ষা করি, আমায় মুক্তি দেওয়া হোক—আমি স্বামীর কাছে যাই।

যোগাচার্য্য। তোমার স্বামী! [বিস্মিত হইলেন]

কাবেরী। [নত বদনে] আমার স্বামী প্রতিষ্ঠানের, যুবরাজ জহ্নু।

যোগাচার্য্য। জহ্নু! [বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন]

বদন। নাও এইবার—

যোগাচার্য্য। জহ্নু! জহ্নু কি? বল কি বালিকা? জহ্নু তোমায় বিবাহ করেছে?

কাবেরী। যদিও যথাশাস্ত্র বিবাহ করেনি, তাহলেও আমি একপ্রকার তাঁরই গৃহীতা, অন্যে কেউ আর আমায় গ্রহণ করবে না—করলেও দ্বিচারিণী হবো। আমার কুমারী ধর্ম্ম গেছে।

যোগাচার্য্য। কি বললে? জহ্নু! আমার পুত্র জহ্নু! শিব হতেও সংযমী সেই জহ্নু তোমার কুমারী ধর্ম্ম নষ্ট করেছে! এতদুর নীচমতি সে? না, হতে পারে না।

কাবেরী। হাঁ বাবা; যখন নদী মূর্ত্তি ধারণ করে কেদারনাথ হতে প্রস্থান করি, তখন আমার মা আমায় কমণ্ডলুর মধ্যে দিয়ে মঙ্গলাচার্য্যের আশ্রমে পাঠান। সেখানে জহ্নু পিপাসায় কাতর হয়ে জল প্রার্থনা করায় মঙ্গলাচার্য্য তাঁকে সেই জলপূর্ণ কমণ্ডলু প্রদান করেন। তখন আমি দ্রবময়ী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করে কমণ্ডলু মধ্যে স্বীয় মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। জহ্নু ব্যস্ততায় জল পান করতে গিয়ে আমার—[লজ্জায় অধোমুখী হইল]

যোগাচার্য্য। বল মা! পিতার সমক্ষে সঙ্কোচ কিসের?

কাবেরী। আমার মুখচুম্বন করেছে। [আরও নতমুখী হইল]

যোগাচার্য্য। ওঃ তবে সেটা ইচ্ছাক্রমে নয়—ভুলক্রমে।

কাবেরী। নারীর মান একটা ভুলেই যায় যে বাবা!

যোগাচার্য্য। [স্বগত] তাই তো, সর্ব্বনাশ! করলাম কি?

বদন। আরে বর ফিরিয়ে নাও—বর ফিরিয়ে নাও; এখনও ভাল চাও তো বর ফিরিয়ে নাও।

যোগাচার্য্য। না, সহস্র ঝঞ্ঝা এসে বসুন্ধরার বুক বিদীর্ণ করে চলে যাক্, উল্কার অগ্নিদাহ সৃষ্টির শৃঙ্খলা জ্বলিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যাক, মূর্খের ধিক্কার—রমণীর বিদ্রূপ—পরাজয়ের কলঙ্ক আমার মাথার ওপর

থাক। তবুও শিববাক্য—শিববাক্য, তার অন্যথা হবে না। কিন্তু মা! বড় ভুল করে ফেললে যে মা! জহ্নু তোমায় পত্নীত্বে বরণ করুক, তাতে আপত্তি নাই; কিন্তু সে তো তোমায় গ্রহণ করবে না মা!

কাবেরী। বাবা! তোমারই ত কথা, পুত্রবতী হবো—ব্যভিচারিণী হবো না।

যোগাচার্য্য। তাই তো! [চিন্তা করিয়া] উপায় করেছি মা! সে তোমার মুখচুম্বন করেছে, সেই অবসরে তুমি তার অর্দ্ধেক শক্তি গ্রাস করেছ। তাতেই গর্ভবতী হবে, যাও মা।

[কাবেরীর প্রণাম ও ধীরে ধীরে প্রস্থান]

যোগাচার্য্য। কি ভাবছিস্ বদন?

বদন। ভাবছি বাবা, এত করে বিয়েটা আট্‌কে আট্‌কে এসে শেষে কি না একেবারে ছেলে কোলে ক'রে বাড়ী গেল। তোমায় বুঝতে পারলুম না বাবা!

যোগাচার্য্য। বুঝতে পারিস্ নাই বদন! এও সেই গঙ্গা। উর্ণনাভের মত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা জুড়ে একটা জাল পাতছে; এই মেয়েটাকে তার কড়ে আঙ্গুলে জড়িয়ে ক্ষমতার শিখরে উঠছে; ভক্তির ভেল্কি দেখিয়ে আমায় ধাপে ধাপে নামাচ্ছে। নইলে রাজকন্যা এ সব পায় কোথায়? নিশ্চয় গঙ্গা আমাদের অলক্ষ্যে পূজার উপকরণ দিয়ে এর কাণে কাণে মন্ত্রণা এঁটে গেছে। এর অপরাধ কি! কিন্তু—কিন্তু নন্দী! আমি তাকে ক্ষমা করবো না। এমন শিক্ষা দেবো, যা দেখলে পর্ব্বত, সমুদ্র, সৃষ্টি, প্রলয়, আলোক, অন্ধকার একযোগে শিউরে উঠবে।

[ক্রোধভরে প্রস্থান]

বদন। পারবে না বাবা! তোমার ও সব মুখের ক্ষিদে—চোখের নেশা। ও সব তোমার কর্ম্ম নয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রতিষ্ঠান রাজপ্রাসাদ—পুরুমীরের কক্ষ।

পুরুমীর ও তরলা।

পুরুমীর। এর চেয়ে আর উচ্চাশা করো না তরলা!

তরলা। তা হলে আমায় পরিত্যাগ করছো?

পুরুমীর। কৈ, এতে তো পরিত্যাগের কথা কিছু নাই। আমি তোমার ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করছি—বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে দিচ্ছি।

তরলা। তুমি কি মনে কর যে, এই নারী জাতটা এক মুঠো পেটের ভাত আর একটু থাকবার জায়গার জন্যেই সারা জীবনটা পুরুষের পিছু পিছু ফেরে

পুরুমীর। না তা মনে করি না। তবে নারী পুরুষের পিছু পিছু ফেরে, তাকে পর্ব্বতের শিখর হতে সমুদ্রের অতল গর্ভে নামাবার জন্য—পুণ্যের আশীর্ব্বাদ হতে ঈশ্বরের অভিশাপে ফেলবার জন্য।

তরলা। কৈ, এ কথাটা তো সেদিন ভাব নাই?

পুরুমীর। কোন দিন?

তরলা। যে দিন আমার প্রথম প্রস্ফুটিত অস্থির যৌবনের মাঝখান দিয়ে তোমার রূপের শকট চালিয়ে দিয়েছিলে, যে দিন একটা সংসার—অনভিজ্ঞা বালিকার চৈতন্য লোপ করতে তোমার পাপের বন্ধু চৈতন্যের দ্বারা কত নূতন নূতন প্রলোভনের ফাঁদ পেতেছিলে. যে দিন আমার

স্বামীকে আমাদের এই অবৈধ গুপ্ত প্রণয়ের একমাত্র অন্তরায় জেনে অন্ধ করেছিলে! [উত্তেজিত হইয়া উঠিল]

পুরুমীর। আমি অন্ধ করেছিলাম?

তরলা। ওঃ—না, ভুল হয়েছে; অন্ধ তুমি করবে কেন? করেছিলাম আমি। আমার হাত দিয়েই হয়েছে বটে! তবেই ভেবে দেখ দেখি, সে কি লালসা—সে কি উন্মাদনা—সে কি প্রলোভন যার টানে নারী আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে!

পুরুমীর। তুমিও জেনো তরলা। যে লালসা নিয়ে তুমি স্বামীকে অন্ধ করেছো, সেই লালসা নিয়ে আমি নিজেও অন্ধ হয়েছি, অপরিণামদর্শিতায় নিজের হাতে এই দীর্ঘ গভীর নরককুণ্ড খনন করেছি—কিন্তু আর না—আর না সর্ব্বনাশী!

তরলা। সর্ব্বনাশী! আমিই তোমার সর্ব্বনাশী বটে! একবার আমার মুখের দিকে সোজা ভাবে তাকিয়ে, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল দেখি, আমি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি, না তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছ?

পুরুমীর। নারী লালসার জন্য নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করতে পারে।

তরলা। পারে।

পুরুমীর। সে তার ভোজবাজীতে বিশ্ব স্তম্ভিত করতে পারে।

তরলা। পারে।

পুরুমীর। সে তার পাশব প্রবৃত্তি গোপন রাখতে নিজের স্বামীকেও অন্ধ পর্য্যন্ত করতে পারে।

তরলা। পারে—পারে—সব পারে—কিন্তু একটা পারে না।

পুরুমীর। কি?

তরলা। একজনকে আশার প্রাসাদে তুলে যথা সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে,

শেষে তার প্রাণটাকে পর্য্যন্ত চুরমার করে এই রকম রাস্তায় ফেলে দিতে পারে না।

পুরুমীর। তরলা! তরলা! আমার মাথা ঘুরছে—ভাবৃতে পারছি না। বল, তুমি আর কি চাও?

তরলা। না, আর কিছু চাই না। একদিন চেয়েছিলাম—যে দিন আমার একটা কথা শোনবার জন্য তুমি উদগ্রীব হয়ে থাকতে, সে দিন চেয়েছিলাম, না চাইতেও পেয়েছিলাম। আজ আর চাইবো না—চাইলেও পাবো না।

পুরুমীর। তবে অভিশাপ দাও, যেন সে বজ্র অভিশাপে আকাশ ফেটে আমার মাথার উপর পড়ে—দাও তরলা! আমি মাথা পেতেছি, অভিশাপ দাও!

তরলা। না, তোমায় বর দিয়ে যাই, সহস্র যোড়শী নিয়ে তুমি সুখে থাক, আর মানব-জন্মে অন্য শান্তি যদি কিছু থাকে, তা হলে সেটা তোমা হতে দূরে—অতি দূরে সরে যাক।

[বেগে প্রস্থান]

পুরুমীর। তরলা—তরলা!—যাক।

ব্যস্তভাবে চৈতন্যের প্রবেশ।

চৈতন্য। আরে, যাবে কি? ফিরোও—ফিরোও।

পুরুমীর। না ভাই, আমি আজ নিজে ফিরছি।

চৈতন্য। এঃ, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে বটে!

পুরুমীর। হয়েছে—কিন্তু এটা আর দিন কতক আগে হয় নাই কেন চৈতন্য?

সুহোত্র ও কেশিনীর প্রবেশ।

সুহোত্র। পুরুমীর!

পুরুমীর। দাদা!

সুহোত্র। বলি, এ সব সত্য?

পুরুমীর। কি সত্য দাদা?

সুহোত্র। যে, আমার পুত্রকে বিবাহের ছলে দেশান্তরে পাঠিয়ে প্রকারান্তরে নির্ব্বাসিত করে, আমায় প্রয়াগ দুর্গে অবরুদ্ধ রাখা?

পুরুমীর। কি বল্‌ছো দাদা?

কেশিনী। অবাক হলে যে? আকাশ হতে পড়লে যে? জানি—দেবর জানি! শঠতার অভিনয় তুমি বেশ দেখাতে পার। তবু—তবু—বল, আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রাসাদের বাইরে যাবার অধিকার নাই কেন?

পুরুমীর। বিশ্বাস কর দাদা, এর বিন্দু বিসর্গও আমি জানি না।

সুহোত্র। জান না?

পুরুমীর। না।

কেশিনী। সত্য বলছো—জান না?

পুরুমীর। না।

সুহোত্র। আচ্ছা, আমি অপুত্রক হেতু মহাদেবের তপস্যা করেছিলাম, জানতে?

পুরুমীর। সে কথা এখন কেন?

সুহোত্র। আরে জান্‌তে কি না, বল না?

পুরুমীর। জানতাম।

সুহোত্র। তারপর ঈশ্বর প্রেরিত এক সন্ন্যাসী আমায় একটী পুত্র দান ক'রে ব'লে দেয় যে, সে পুত্র সংসারী হবে না, সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী হবে,

আর তিনি তাঁকে ইচ্ছামত শিষ্যত্বে বরণ করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তাতে আমার আপত্তি চলবে না। আমি স্বীকার হয়ে আছি—আর সেই পুত্র আমার জহ্নু; জানতে ?

পুরুমীর। জানতাম।

সুহোত্র। তারপর সে পুত্রের দ্বারা আমার কোন উপকার নাই ভেবে, প্রয়াগ রক্ষা ও জলপিণ্ডের ভাবনায় দ্বিতীয় বার তপস্যা করি; তাতেও সিদ্ধ হই, জানতে ?

পুরুমীর। জানতাম।

সুহোত্র। সেবার রাণী এক মৃত পুত্র প্রসব করে, তাও জানতে ?

পুরুমীর। [চমকিত হইয়া পরে সংযত ভাবে বলিলেন] হাঁ।

সুহোত্র। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে পুত্রটী মৃত ছিল না!

পুরুমীর। চুপ কর—চুপ কর দাদা! [বিচলিত হইয়া উঠিলেন]

সুহোত্র। [উত্তেজিত হইয়া] চুপ করবো কি! এত শীঘ্র চুপ করা কি চলে! বল্‌তে দাও—শেষ পর্য্যন্ত বল্‌তে দাও—আর কথা গুলো সত্য কিনা, বলে যাও।

পুরুমীর। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর দাদা! যা হবার হয়েছে, আর সে কথা কাকেও শুনিও না!

সুহোত্র। না পুরু! আর আমি চোখের জল গোপন করে রাখতে পারছি না। আজ আমি জগতকে উচ্চকণ্ঠে শোনাবো যে, আমার ভাই তার নিজের ছেলেকে রাজা করবার জন্য ধাত্রীকে হস্তগত করে প্রসবাগারে একটা মরা ছেলে রেখে, তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে বধ করেছে; [ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন]

পুরুমীর। ওঃ! [মুখ ঢাকিলেন]

কেশিনী। ভাল কর নাই দেবর! মনে করেছিলে, এটী আর

প্রকাশ হবে না। ছিঃ—ছিঃ! করেছো কি! বুকের রক্তকে একবার চক্ষে দেখতে দিলে না।

সুহোত্র। [প্রকৃতিস্থ হইয়া] পুরু! এ সব তো সত্য? বল? জান?

পুরুমীর। [অর্দ্ধ স্বগত] হায়, তা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

সুহোত্র। চলে এস রাণি! [কিছু দূর গিয়া ফিরিলেন] এতগুলো সব জানো, আর আমাদের বন্দী করলে কে, সেইটেই বুঝি জান না?

[প্রস্থানোদ্যত]

পুরুমীর। দাঁড়াও দাদা! পায়ে ধরি, আমায় বিশ্বাস কর—বিশ্বাস কর—বিশ্বাস কর।

সুহোত্র। তোমায় বিশ্বাস! পারলাম না ভাই।

[কেশিনী সহ প্রস্থান]

পুরুমীর। চৈতন্য! চৈতন্য! এতদিন ধরে পরিশ্রম করে আমি আজ একটী নূতন জিনিষ অর্জ্জন করেছি।

চৈতন্য। কি?

পুরুমীর। জগতের অবিশ্বাস।

চৈতন্য। এই কথা! আরে নাও—নাও; ও বিশ্বাস অবিশ্বাস সমান কথা। কেবল একটী "অ" এর ইতর বিশেষ বৈতো নয়! তা' তোমার 'ও' "অ" এর আর দাম কি? সামনে তাজা রকম একটা কিছু থাকলেই ব্যাকরণের ঠেলায় অমনি "অ" লোপ। তুমিও জগৎটার সামনে চোখ রাঙিয়ে থাক, দেখবে কেউ কিছু বলতে পারবে না, ও অবিশ্বাসের "অ" একদম বাজার ছাড়া।

পুরুমীর। না চৈতন্য! আমি সংসারকে প্রতারিত করতে পারি, কিন্তু নিজেকে বোঝান শক্ত! চৈতন্য! চৈতন্য! আমি কি না করেছি!

কাম-বশে একজনকে অন্ধ করিয়ে তার মান সম্ভ্রম সহধর্ম্মিণীকে ঘরে এনে রেখেছি, রাজ্য লোভে ভ্রাতুষ্পুত্রকে নাশ করেছি, কুশিক্ষায় পুত্রকে পশু করেছি। কিন্তু আর না। এইবার একবার ফিরবো। চৈতন্য! তুমিই আমার মন্ত্রণাদাতা—তুমিই আমার পাপের সহায়—তুমিই আমার নরক। তোমায় আমি—না—যাও। বন্ধু বলেছি—আর কিছু করলাম না, আজ তোমাকেও বিসর্জ্জন দিলাম।

[প্রস্থান]

চৈতন্য। তাইতো বাবা, এখন আমি দাঁড়াই কোথা? আমার যে কুলও গেল, শ্যামও যায়! আ-হা-হা! তোষামোদের ব্যবসাটা দিব্য চলেছিল, এমন অসময়ে পুঁজিহারা হলুম! যা হোক বাবা, বিসর্জ্জন তো অনেক রকম দেখেছি, এটায় কিন্তু একটু বেশী রকম ধূমধাম দেখ্‌ছি। একেই কি বলে ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন! কিন্তু এখন আমার উপায় কি? একটা চাকরী বাকরী তো চাই! আহা—হতাম যদি মেয়েমানুষ, তাহলে কি চাকরীর ভাবনা! যেখানে যেতুম—লোকে আদর করে লুফে নিতো। তাহলে কি আর রোজকারের ভাবনা ছিল? কিন্তু এই গোঁপ জোড়াই আমায় মেরেছে! হায়—হায়—এই এমন সুন্দর গোঁপ জোড়া এর কদর কেউ বোঝে না—

গীত ঃ

পোড়া গোঁফের কদর করে কে?
আমার মাল কাটে না, লোক পটে না
চায় না রে কেউ আড় চোখে।
থাক্‌তো যদি হাতে চুড়ী
গোঁফের বদল ঠোঁটের ডগে হাড় ভাঙ্গা হাসি,
পরণে পদ্ম-পাছা,

চোখের কোণে চোরা বাণ, গলাতে বাঁশী,
আমায় এই খাস্তা গোড়ে অনাদরে হয় কিরে বাসি,
রাশি মালে গরব ক'রে, দিতাম দর বুকের জোরে,
এই ক'খি চুলের ফেরে পড়ে, আমার মরণ হলো সাত পাকে।

সংকল্প ও কনকের প্রবেশ।

সংকল্প কনককে বেত্রাঘাত করিতেছিলেন।

কনক। [কাতর স্বরে] মেরো না—আর মেরো না দাদা! পিঠ ফেটে গেছে—হাত দিয়ে রক্ত ঝর্‌ছে!

সংকল্প। মারবো না! এই একটা সামান্য কাজ তোর দ্বারা হয় না, বল্ করবি কিনা?

কনক। তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আর যা বল্‌বে কর্‌বো, কিন্তু মহারাজের ওষুধের সঙ্গে বিষের বড়ি রেখে আসতে পারবো না।

সংকল্প। এ বড়ি বিষের বড়ি, তোকে কে বল্‌লে?

কনক। আমার মন বল্‌ছে। বিষ বড়ি না হলে এত গোপনে রেখে আসবার কি দরকার?

সংকল্প। [কপট স্নেহে] কনক! তুই ছেলেমানুষ, বুঝতে পারছিস না; এতে ভবিষ্যতে তোরও ভাল হবে।

কনক। না দাদা! আমি ভাল চাই না, জগতের যত মন্দ, সব আমার জন্য জমা হয়ে থাকুক।

সংকল্প। তবে রে! [পুনরায় প্রহার]

কনক। রক্ষা কর—রক্ষা কর! ওগো কে আছ, আমায় রক্ষা কর।

উন্মত্তা তরলার প্রবেশ।

তরলা। মার—মার—বিরাম দিও না—আত্মহারা হয়ো না—কাকুতি শুনো না। [উত্তেজনায় অধীর হইয়া পড়িল]

কনক। মা—মা—[ক্রন্দন]

তরলা। চুপ! কে তোর মা? মা কখনও এমন হয়? মা কখনও পুত্রঘাতী পাষণ্ডের প্রতিশোধ না নিয়ে, তাকে অভিশাপে না পুড়িয়ে, তার টুঁটি কেটে কুকুরের মুখে না দিয়ে, তাকে উত্তেজিত করে? কুমার, তুমি থামলে কেন? চালাও—চালাও শক্তির শেষ বিন্দু দিয়ে বেত চালাও। কেউ বাধা দেবে না—এর জন্য কেউ এক ফোঁটা চোখের জল পর্য্যন্ত ফেলবে না, ও পাপের রক্তে তৈরি, পাপের সঙ্গে মিশে যাবে। কোন ভয় নাই।

সংকল্প। যাও নারী! এখান হতে যাও, এটা উন্মাদের প্রলাপাগার নয়।

তরলা। উন্মাদ! আমি উন্মাদ! হা হা হা—কুমার! একদিন ছিলাম বটে উন্মাদ—আজ বুঝি আমার তুল্য স্থির মস্তিষ্ক নারী আর পৃথিবীটায় নাই। আজ আমার চমক ভেঙ্গেছে, আমি কে জান?

সংকল্প। [অবজ্ঞাভরে] তুমি আমার পিতার রক্ষিতা একটা নগণ্যা কুলটা।

কনক। দাদা! [উত্তেজিত হইয়া সংকল্পের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিল]

তরলা। চুপ!

কনক। কি বল্‌ছো দাদা?

[সংকল্পের ব্যঙ্গহাস্য ও প্রস্থান]

তরলা। চুপ! কথা ক'স্‌নে, ঠিক বলছে।

কনক। [সবিস্ময়ে] কি মা! তুমি কুলটা?

তরলা। [ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে আবেগ ভরে বলিল] ঈশ্বর! ঈশ্বর! আজ পুত্র জিজ্ঞাসা করছে, মা—তুমি কুলটা?

কনক। মা!

তরলা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওরে সত্যই তাই আমি—সত্যই জগতের ধিক্কার আমি।

[কনক নির্ব্বাক বিস্ময়ে এক দৃষ্টে তরলার মুখপানে চাহিয়া রহিল]

তরলা। কি দেখছিস? হাঁ করে মুখের দিকে কি দেখছিস? নরকের প্রতিবিম্ব? না পুত্র! এ বুঝি তারও অতীত! ওরে কুলটায় শুধু নিজের রূপ বেচে খায়, আমি আমার স্বামীর চোখ পর্য্যন্ত খেয়েছি।

কনক। ও—হো—হো! [ঘৃণা ও লজ্জায় মস্তক অবনত করিল]

তরলা। ওকি! মুখ নামালি যে? ঘৃণা হলো? কনক! আমি জগতের ঘৃণ্য হয়ে থাকতে পারি, কিন্তু তোর—না। এই নে—এই ছুরি নে—আমায় বধ কর—আমায় বধ কর।

[ছুরিকা বাহির করিয়া কনকের সম্মুখে ধরিল]

কনক। না, তুমি সৃষ্টির বিস্ময়—তুমি পতিঘাতিনী—তুমি কুলটা—যাই হও, তবু তুমিই আমার মা! মা! মা! [স্নেহে বিভোর হইয়া বক্ষে পতিত হইল]

তরলা। বাবা! বাবা! [বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া] ঈশ্বর! এইখানটায় তোমায় ধন্যবাদ দিই! তোমার সৃষ্টিকেও বাহবা দিই। পাষাণে এমন কোমলতা! কুলটার জন্যেও এমন পবিত্র পুত্র স্নেহ?

কনক। মা!

তরলা। আর না—আর না, চলে আয় কনক চলে আয়—আমরা এখান হতে পালাই—এ রাজপ্রাসাদ আমাদের সহ্য হবে না—

[উভয়ের প্রস্থান]

সংকল্প ও পুরুমীরের প্রবেশ।

পুরুমীর। সংকল্প! চারিদিকে এ সব কি শুনছি?

সংকল্প। কি শুনছ?

পুরুমীর। এই যে—দাদা—বৌদিদি নাকি বন্দী?

সংকল্প। হাঁ—পিতা, আমিই রাজা রাণীকে এক প্রকার বন্দী করেছি।

পুরুমীর। তুমিই করেছ? বেশ—বেশ—বড় সুসংবাদ!

সংকল্প। কিন্তু তাতেও তাঁরা নিরস্ত নন, নানা প্রকার কৌশলে পালাবার চেষ্টা করছেন; সেজন্য আমিও একটা উপায় উদ্ভাবন করেছি।

পুরুমীর। [উদভ্রান্তভাবে] করেছ—করেছ? বাহবা—বাহবা! শুনি সে উপায়টা?

সংকল্প। সেই জন্যেই আজ কনককে একটু শাসনও কর্ত্তে হয়েছে। তার দ্বারা রাজার ঔষধের বটিকার সঙ্গে এই বিষ বটিকাটী রাখতে পাঠালাম, তা সে পারলে না।

পুরুমীর। [চমকিয়া] বিষ বড়ি? এ্যাঁ—বিষ বড়ি! বলিহারী, বলিহারী। সাবাস পুত্র! কি বুদ্ধি! দেখি সে বড়িটা। [সংকল্পের হস্ত হইতে বটিকা গ্রহণ] বা—বা—বা! সুন্দর জিনিষ তো! বেশ সুঠাম গুলি তো! চমৎকার রঙ্গিন সৃষ্টি তো! খাবো?

সংকল্প। খাবে কি পিতা?

পুরুমীর। খুব খাবো। আমি চিরকেলে লোভী, তা এ লোভটাও সম্বরণ করতে পারছি না সংকল্প ! যা হয় হোক—নিই খেয়ে।

[বটিকা ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন]

সংকল্প। [পুরুমীরের হস্ত হইতে বটিকা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন] কর কি—কর কি ? এযে বিষবড়ি !

পুরুমীর। তাই তো এত আগ্রহে খাচ্ছিলাম। আমার বিষ খাওয়াই ঠিক পুত্র ! আমি জিনিষটা আজ অনেকটা ধারণা করে নিইছি। আমি মানুষ—ঈশ্বরের সার সৃষ্টি, তাতে আবার মানুষের সেরা মানুষ—প্রতিষ্ঠানের রাজবংশে আমার জন্ম। কিন্তু আমার প্রবৃত্তিগুলো দাঁড়িয়েছে ঠিক পশুর স্বেচ্ছাচার, শিক্ষাগুলো হয়েছে ব্যাধের নিষ্ঠুরতা ; চেহারাখানা হয়েছে একটা প্রেতের কঙ্কাল। আমার মরাই ঠিক নয় ?

সংকল্প। কি বল্‌ছো বাবা ?

পুরুমীর। যা বল্‌ছি, এমন যথার্থ বুঝি এ জীবনে আর কখনও বলি নাই। পুত্র ! যা করেছ—করেছ, আর কাজ নাই—ফের।

সংকল্প। ফিরবো ? ফিরবো কি পিতা ?

পুরুমীর। ফিরবে না ?

সংকল্প। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে পিতা ! ফিরবো কি ? যুদ্ধের তালে তালে নাচতে নাচতে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি, আর তার রশ্মি সংযত করবার উপায় নাই।

পুরুমীর। সংকল্প ! সংকল্প ! তুই তো এমন ছিলি না, তোকে এই দুর্ম্মতি দিলে কে ?

সংকল্প। [দৃঢ়স্বরে] তুমি !

পুরুমীর। আমি ?

সংকল্প। হাঁ, তুমিই আমার এ প্রবৃত্তি জাগিয়ে দিয়েছ, তুমিই আমার

প্রাণে লালসার বীজ পুতেছ, তুমিই সাপকে সাহস দিয়েছ—আগ্নেয় পর্ব্বতের মুখ খুলেছ—জলপ্রপাতের বাঁধ ভেঙ্গেছ। সে সৃষ্টি ছাপিয়ে চলবে—পার তো ধরে রাখ,—আমার সাধ্য নাই।

পুরুমীর। তবু—তবু বাবা! একটু চেষ্টা করলে হতো না?

সংকল্প। কি নিয়ে চেষ্টা করবো বাবা? তুমি আমায় প্রবৃত্তি দিয়েছ—নিবৃত্তি দাও নাই; লালসা দিয়েছ—সহিষ্ণুতার ছায়া পর্য্যন্ত চিনতে দাও নাই; উচ্ছৃঙ্খলতার রাজ্যে ফিরিয়েছ—সাম্যের মন্দিরে একটীবারের জন্যও উঠতে দাও নাই। আজ চেষ্টা করবো কার বলে?

পুরুমীর। পাষণ্ড।

সংকল্প। সে কথা অতি সত্য। পিতা যার পশুর অধম—লম্পটের চূড়া—সৃষ্টির আবর্জ্জনা, তার পুত্র পাষণ্ড—নরাধম না হয়ে কি ঋষি হবে?

পুরুমীর। ও—হো—হো! ঠিক ধর্ম্মের কাঁটা নিক্তির ওজন। না পুত্র, তুমি বেঁচে থাক। সহস্রবর্ষ তোমার পরমায়ু হ'ক—আর দীর্ঘকাল ধরে প্রতি নিশ্বাসে—প্রতি চাহনিতে—তুমি এই রাজত্ব অনুভব কর।

[প্রস্থান]

সংকল্প। [চিন্তান্তে] না—এ বিষবড়ি তোমার খেলেও মন্দ হতো না।—কে?

চরের প্রবেশ।

চর। যুবরাজ জহ্নুর সংবাদ!

সংকল্প। বল।

চর। মহারাজ যুবনাশ্বের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত—আহত—মূর্চ্ছিত!

সংকল্প। উত্তম! এস অন্তরালে, সব কথা শুনবো।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুষ্পোদ্যান।

অর্দ্ধশায়িত জহ্নু, চিন্তায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ, বালকবেশে কাবেরী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন।

কাবেরী। রাজকুমার!

জহ্নু। কে?—

কাবেরী। সুস্থ হয়েছেন যুবরাজ?

জহ্নু। আমি কোথায়?

কাবেরী। উঠবেন না—আপনি নিরাপদ। আমায় আপনি চিনতে পাৰ্চ্ছেন না?

জহ্নু। তোমায় যেন কোথায় দেখেছি!

কাবেরী। আমি সেই বালক। যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন, আমি গিয়ে আপনাকে সৈন্য ব্যূহের মধ্য থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি।

জহ্নু। ওঃ—মনে পড়েছে। আমি পরাজিত—যুদ্ধে পরাজিত! কি লজ্জার কথা! শেষে এক বালকের দয়ায় রক্ষিত!

কাবেরী। এটী নিশ্চয় দৈব বিড়ম্বনা—নৈলে একা আপনি লক্ষ সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করেছেন। আপনার ন্যায় বীর এই সামান্য যুদ্ধে পরাজিত হন্!

জহ্নু। বালক! তুমি আমায় মৃত্যুর দ্বার হ'তে ফিরিয়েছ, বল বালক! তুমি এর কি পুরস্কার চাও?

কাবেরী। যুবরাজের জীবন রক্ষা করতে পেরেছি, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

জহ্নু। তবু, তবু, এই যে পুষ্প-সুবাসিতা রত্নোজ্জ্বলা বালার্ক কিরীটিনী বসুন্ধরা, যার বুকে শ্যামসম্পদের অনাবিল স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে—যার চারি পার্শ্বে কত যুগের, কত অতীতের, কত আরাধনার ভোগ্য বস্তু ছড়ান রয়েছে, বালক! বালক! এর মধ্যে কি তোমার প্রার্থিত কিছুই নাই?

কাবেরী। না, ভোগে আমার সুখ নাই, ত্যাগেই আমার তৃপ্তি, গ্রহণে আমার আনন্দ নাই, দানেই আমার হর্ষ, প্রীত হ'য়ে লাভ নাই, প্রীতি দিয়েই মোক্ষ। যুবরাজ! একান্তই যদি পুরস্কার দিতে চান, তবে আর কিছুই চাই না, আমার স্বহস্ত রচিত এই মালা গাছটী ভক্তি ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করুন।

[কাবেরী স্বীয় কণ্ঠ হইতে পুষ্পমালা উন্মোচন
করিয়া জহ্নুর গলদেশে অর্পণ করিল]

জহ্নু। উত্তম! এ মালা আমার জয়মাল্য হোক! তবে বালক! তোমার এ কুসুম মাল্যের বিনিময়ে আমারও প্রীতির নিদর্শস্বরূপ এই মণিমাল্য গ্রহণ কর।

[জহ্নু কাবেরীর গলদেশে স্বীয় মণিমাল্য পরাইয়া দিলেন]

কাবেরী। বেশ, তবে এ মালা আমার বরমাল্য হোক্।

জহ্নু। বরমাল্য? বরমাল্য কি বালক? [সবিস্ময়ে কাবেরীর মুখ নিরীক্ষণ]

কাবেরী। আমি বালক নই যুবরাজ—আমি বালিকা।

জহ্নু। [সমধিক বিস্ময়ের সহিত বলিলেন] বালিকা!

সহচরীগণের গীতকণ্ঠে প্রবেশ।

গীত।

অবাক হ'লে কিসের তরে বঁধু ?
তোমার তরে রাখা এযে খাঁটী পদ্মমধু।
চোখে দিলে সারবে চোখের রোগ
দেখবে বিশ্ব রঙিন সরস নিত্য নূতন ভোগ,
আনন্দে প্রাণ উঠবে নেচে শুধু।

জহ্নু। একি বিস্ময়! বালিকা, বল তুমি কে ?

কাবেরী। আমি সেই অনাদৃতা, অত্যাচার জর্জ্জরিতা কমণ্ডলু-বাসিনী নিরাশ্রয়া বালিকা। সেই চির-উন্মাদিনী তোমাগতপ্রাণা যুবনাশ্ব-কন্যা কাবেরী। আশার আকর্ষণে, প্রণয়ের প্রলোভনে, আমি সব হারিয়ে তোমার পিছু পিছু ছুটেছি, নিরাশ করো না, কঠিন হয়ো না। ক্ষত্রিয় তুমি, মাল্য পরিবর্ত্তন করেছ,—গ্রহণ কর! পত্নী বলে না হোক, অন্ততঃ দাসী বলেও।

[কাবেরী আর কথা বলিতে পারিল না, আবেগে কণ্ঠ রোধ হইল, জহ্নু নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন]

সহচরীগণের পুনরায় নৃত্য গীত।

গীত।

যদি করেছ রচনা স্বপ্নকুঞ্জ
কল্পনা হ'তে ছাঁকিয়া।
তবে নিভৃতে নয়ন নীরে
সখা কেন না রাখিব আঁকিয়া।
আমি চাহি না তো কারো লোল অপাঙ্গ,

মাধুরিমা মাখা নয়ন খানি,
চাহি না কাহারো কোলেতে ঘুমাতে,
প্রীতি চুম্বন আদর বাণী
নহি বঁধু আমি পারিজাত,
হবো আপন বিভায় প্রতিভাত,
বিশ্বের শুধু প্রণিপাত আমি,
চাহিব নিম্নে থাকিয়া।
এ সুখ কাহিনী আপনি কহিব,
আপনারে আমি ডাকিয়া।

জহ্নু। [প্রকৃতিস্থ হইয়া]
কাবেরী—কাবেরী ! ছলনারূপিণী !
জীবন দায়িনী তুমি,
তবু সাবধান !
এ কটু কাহিনী পুনঃ আনিও না মুখে !
অন্যায় সংগ্রামে আমি দৈবিক মায়ায়
পরাভূত, অচেতন,—
আনি মোর হৃত তুরঙ্গম,
বালকের বেশে তুমি যুবনাশ্ববালা,
সে সঙ্কটে করেছ উদ্ধার—
ক্ষমিলাম প্রবঞ্চনা !
চাহ অন্য পুরস্কার,
স্বর্গের অমিয় প্রীতি,
মর্ত্ত্যের ঐশ্বর্য্য রাশি,
পৃথিবীর যত ভোগ দানিব তোমায়।

নহি আমি লম্পট কামুক,
তুচ্ছ জীবনের দামে
করিব না কভু হৃদয় বিক্রয়।

কাবেরী তাই যদি হয়,
এতই হৃদয়বান যদি তুমি যুবরাজ,
কেন বা হানিলে বাজ
কুমারী-ধরমে মোর ?
কেন কর এ মুখ চুম্বন ?

জহ্নু দোষ মোর অকারণ !
কমণ্ডলু মধ্যে তুমি ঘোর মায়াবিনী
কেমনে জানিব ছল ?
অজ্ঞানে অজ্ঞাতসারে
পিপাসা আবেগে,
নহে কলুষিত চিতে,
করেছি বদন স্পর্শ,
নহি আমি দায়ী তায়,
কিম্বা সমাজের জঘন্য প্রথায়
যদি হই অপরাধী,
পশিব অনল কুণ্ডে—
ঝাঁপিব সমুদ্রে—
প্রায়শ্চিত্ত করিতে পাপের।

কাবেরী সহজ উপায় তব
মুছিতে এ কলঙ্ক কালিমা।
প্রবল পুরুষ তুমি ইচ্ছা যদি কর,

লম্পট হইতে হ'তে পার মহর্ষি প্রধান।
কিন্তু মতিমান!
কি গতি আমার?
শত তেজঃ তপস্যার,
শত দয়া বিধাতার
ধৌত করি শত বার
পারিবে না আর ফিরাতে আমায়,
তব তেজঃ গ্রাস করি গর্ভবতী আমি।

জহ্নু। আরে আরে নগণ্য কুলটা!
কদর্য্য প্রবৃত্তিরূপা ঘৃণ্য কামকলা!
কলঙ্কের ডালি তব
দিতে চাও শিরে মোর?
সাধি সঙ্গোপনে পাশব প্রবৃত্তি;
সমাজের চক্ষে দিয়ে ধূলি
ঢাকিতে সে পাপ ইতিহাস
চাহ মোরে আবরণরূপে তার?
দূর হও—দূর হও স্বেচ্ছাচার!
কে করে প্রত্যয়,
মম তেজঃ করেছ আশ্রয়?

কাবেরী। তব শক্তি যদি না হরিব,
জগৎ বিজয়ী বীর তুমি,
কেন আজ শ্রান্ত—পরাজিত
সামান্য সমরে?
না হয় প্রত্যয় যদি,

অতীতের পর পর দেখ মিলাইয়া।
দেখ সেই ভগীরথ—
দেখ সে মান্ধাতা,
মন্ত্রঃপুত বারি পান হেতু
পুরুষের গর্ভে লভিলা জনম।
আরও যদি চাও,
দেখ সেই উমা তারা দুর্ব্বাসা সংবাদ।

জহ্নু। স্বর্গের কাহিনী—বেদের সঙ্গীত
ঈশ্বরের দান,
তার সনে হয় না তুলনা কারো।
ঋষি-বাক্য ভিত্তি সে সবার!

অন্তরীক্ষে মহাদেবের আবির্ভাব।

মহাদেব। এও শিববাক্য—শিববাক্য জহ্নু!

[অন্তর্দ্ধান]

জহ্নু। কে—কে তুমি হে অশরীরী—
উচ্চকণ্ঠ ভাষাময়,—
কলুষিয়া এ জহ্নুর চির ব্রহ্মচর্য্য
হরে নিলে মহাশক্তি,
বাজালে বসুধা-কর্ণে কি কটু রাগিণী?
হে আকাশবাণী!
এই যদি শিব-বাক্য,
অশিব কাহারে বলি?

তবু—তবু তুমি শিব,
আমি দাস তব,
লইলাম শির পাতি
বর আবরণে এই ঘোর অভিশাপ !
কিন্তু করো ক্ষমা,
সংসার আশ্রম হ'তে
লইনু বিদায় আজি,
ক্ষমা করো—ক্ষমা কর বালা।

[প্রস্থানোদ্যত]

সহসা গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। দাঁড়াও জহ্নু! আমার একটা কথার উত্তর দিয়ে যাও! সংসারটা কি একটা উঠ্‌বার আশ্রয় নয়? যেখানে মাতার স্নেহ, পত্নীর প্রণয়, পুত্রের প্রীতি—

জহ্নু। যেখানে ষড়রিপু, শত অধঃপতন, সহস্র দুঃখের ষড়যন্ত্র—বল—বল—

গঙ্গা। তবু—

জহ্নু। এর মধ্যে তবু নাই—কিন্তু এ তুমি কি করলে গঙ্গা, আমার এমন ব্রহ্মচর্য্যটা প্রতারণায় মাটী করলে?

গঙ্গা। করলাম—কেন জান? তোমারই পিতার কাকুতিতে—তোমায় সংসারী করবার জন্য!

জহ্নু। তাই পিতার হর্ষবর্দ্ধন করতে, পুত্রের মাথায় বজ্রাঘাত করেছ? বেশ থাক তুমি গঙ্গা, তোমার মাহাত্ম্য নিয়ে অযাচিত ভাবে

ব্রহ্মাণ্ডময় বর দিয়ে বেড়াও। আমিও দেখি, আমার জহ্নুত্ব কোথায়—কত দূরে—

[প্রস্থানোদ্যত]

গঙ্গা। কোথায় তুমি যাবে জহ্নু?

জহ্নু। কোথায় যাব? জানি না! আমি আমার শক্তি হারিয়েছি, তবু ইচ্ছা করছে, দীপ শিখার মত এই নির্ব্বাণ কালটায় একবার জ্বলে উঠি,—ব্রহ্মাণ্ডের বুকে একটা প্রলয়ের অগ্নিকাণ্ড বয়ে যাক্। জানি না—কোথায় যাব। তবে যাব—যাব গঙ্গা! কেন্দ্রচ্যুত উল্কার মতই জহ্নুত্বকে ধ্বংস করতে ছুটবো, তবে এটাও ঠিক জেনো—সেই ধ্বংসের আগুনে এই ব্রহ্মাণ্ডের বুকে প্রলয়ের আগুন জ্বেলে দিয়ে যাব।

[প্রস্থান]

কাবেরী। মা—মা— [গঙ্গার বক্ষঃলগ্ন হইল]

গঙ্গা। তুই-ই সর্ব্বনাশ ক'রেছিস কাবেরী। আর একটু ধৈর্য্য ধরতে পারলি না? যখন সন্ন্যাসীরূপী শঙ্কর তোকে বল্‌লে—জহ্নু তোমায় বিবাহ করবে—কিন্তু গ্রহণ করবে না, তুই তাতেই সন্তুষ্ট হলি? তিনি আশুতোষ, তখন যা চাইতিস্, তাই যে পেতিস্।

কাবেরী। তখন এতটা জানতেম না মা! স্বামী যে এমন জিনিষ—স্বামী যে নারীর জাগ্রতে ধ্যান—নিদ্রায় স্বপ্ন—ইহকালে সম্পদ—পরকালে স্বর্গ—তাঁর দর্শন তীর্থ—অদর্শন অভিশাপ, তা বুঝি তখন বুঝতে পারি নাই মা! আজ বুঝেছি—আজ হারিয়েছি! মা—আমার—[গঙ্গার বক্ষে মুখ লুকাইল]

গঙ্গা। [স্নেহকরুণ কণ্ঠে] অভাগিনী কন্যা আমার! কাঁদিস না! জহ্নুকে আমি ফেরাবো। সে এখনও জানে না, পিতা তার বন্দী—মাতা তার শোকে উন্মত্ত প্রায়। এ সংবাদ যখন সে শুনবে—তখন সে কিছুতেই

স্থির থাকতে পারবে না। তাকে আসতেই হবে ফিরে, এই সংসারের বাঁধনের মধ্যে—নিজের কর্ত্তব্য সাধন করতে ;—আর যদি তা না হয়, যদি সে নাই ফেরে, তাতেই বা দুঃখ কিসের মা ? আমি তোকে আত্মা দিয়ে ঘিরে রেখে দেবো—আমি তোর সকল সন্তাপ বুক পেতে নেবো। আমি তোকে পতি দিতে না পারি, তা হ'তে উচ্চ—তা হ'তে মধুর—তা হ'তে প্রেমময় জগৎপতির পাদপদ্ম দেখাবো।

[কাবেরীকে বক্ষে ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

চিন্তিত ভাবে চৈতন্যের প্রবেশ।

চৈতন্য। চাকরী চাই বাবা—চাকরী চাই! যেমন ক'রে হোক, আজ সন্ধ্যের মধ্যে চাকরী চাই-ই—চাই। নইলে ঘরের দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ। ওঃ, গৃহিণী বেটী বলে কিগো! আমার ঘর, আমার দোর, আমার সব—আজ দু-দিন মাত্র চাকরীটা ছুটে গেছে, এর মধ্যেই বলে কি না রোজগার ক'রতে পার না, ঘরের কোণে ব'সে গিল্‌তে লজ্জা করে না—বেরোও বাড়ী হ'তে! ওঃ—বেটী যেন তার বাবার ঘর থেকে এনে গেলাচ্ছে! কি করবো! একটু কড়া ক'রে ব'লতে গেলেই অমনি বৈশাখী মেঘ গর্জ্জনম্—সঙ্গে সঙ্গে সম্মার্জ্জনী ধারা বর্ষণম্। হে চাকরীরূপী মহাবাহো! হে গৃহিণী-বদন্ প্রফুল্লকারিণ্! হে দিব্যাঙ্গ! হে অধম পরিত্রাতা! হে মুদ্রা পিতা! কোথায় তুমি? কোন মহাজনের

অন্ধকার গোলদারী দোকানে তুমি লুক্কায়িত প্রভু? দেখা দাও—দেখা দাও প্রভু! এই আমি তোমার ধ্যানস্থ হ'লাম, অভয় না দিলে ছাড়ছি না! [উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইল]

যুবনাশ্ব-চরের প্রবেশ।

চর। কে হে এখানে?

চৈতন্য। এসেছ প্রভু? এসেছ কাঙালের সখা? এতক্ষণে দাসে দয়া হয়েছে? যদি এসেছ দীনের সখা, তবে আর ওখানে কেন? দাসের হৃদয়ে এসে তাপিত প্রাণ শীতল কর।

[আলিঙ্গনোদ্যত]

চর। চোপরাও উল্লুক।

চৈতন্য। এঁ্যা এঁ্যা! তবে কে তুমি আমার ধ্যানভঙ্গ করলে? ওঃ—তুমি অপ্সরা?

চর। অপ্সরা!

চৈতন্য। নিশ্চয়ই অপ্সরা।

চর। এমন গোঁফ—এমন দাড়ী, আমি অপ্সরা কি হে?

চৈতন্য। তোমার চোদ্দপুরুষ অপ্সরা! বাবা, আমার বরাবর জানা আছে, কারো ধ্যান ভঙ্গ করতে হ'লেই দেবরাজ অমনি অপ্সরা পাঠায়। নিশ্চয় তুমি অপ্সরা, তুমি গুঁফো অপ্সরা! বল বল পাষণ্ডি! তোমার নাম কি? রম্ভা না নারিকেলী? ঘৃতাচী না দধিচী?

চর। তুমি কার ধ্যান করছিলে?

চৈতন্য। জান না? আবার প্রতারণা করছো? ধ্যান করছিলাম চাকরী মহাশয়ের।

চর। ওঃ, তুমি তো গোড়াতেই গলদ ক'রে ব'সে আছ! চাকরী

মহাশয়াকে বল্‌লে—মহাশয়! তিনি পুরুষ নন্ রমণী—অভিমানিনী—চির আদরিণী।

চৈতন্য। এঁ্যা, তাই নাকি! তবে তো বড় ভুল করেছি! ওঃ—তাই বুঝি তিনি আমায় দর্শন দিলেন না! পদ্দী পিসীকে রামধন বলে ডাকলে কি সাড়া পাওয়া যায়?—তাই তো!

চর। ওহে, তুমি চাকরী করবে?

চৈতন্য। হা হা হা! তাই তো বলি, মহাশয় স্বয়ং চাকরী না হ'লেও তাঁরই প্রেরিত অবদূত! অধমকে ছলনা করছেন! বলি কোথায়?

চর। আমাদের রাজবাড়ীতে! আমি রাজা যুবনাশ্বের চর।

চৈতন্য। রাজা যুবনাশ্বের চর এখানে?

চর। সে অনেক কথা, এখন চাকরী করবে কি না বল?

চৈতন্য। খুব করবো। আমার ও রাজা-রাজড়া ঘেঁসা আছে।

চর। বেশ—বেশ! চল—তুমি মহারাজের কাছেই থাকবে।

চৈতন্য। আচ্ছা, তোমাদের মহারাজ কি করেন?

চর। মহারাজ রাজত্ব করেন, আবার কি করেন?

চৈতন্য। একটু ফুরতি টুরতি?

চর। না।

চৈতন্য। মহারাজের কে আছেন?

চর। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আবার কি চাই তোমার?

চৈতন্য। সেই যে, রাজা-রাজড়াদের খসড়া কপালটুকিতে যা' দু'-একটা থাকে?

চর। না, মহারাজের আমাদের সে দোষ নাই।

চৈতন্য। মহারাজ কি খান?

চর। লুচি, মাংস, মিষ্টান্ন!

চৈতন্য। আর কিছু ?

চর। আম, লিচু, নারিকেল, কদলী।

চৈতন্য। কোনও নেশা টেশা ?

চর। কিছু না !

চৈতন্য। দু'চার ছিটে ?

চর। না।

চৈতন্য। এক আধ টিপ্ ?

চর। না হে না, মহারাজ আমাদের নির্দ্দোষ; তোমার কোন ভয় নেই।

চৈতন্য। ভয় তো নেই, তা বাবা, ভরসাটাও একেবারে ঘুচিয়ে দিলে ! তোমাদের মহারাজ রাজ্য করেন, না খেলা করেন ! তার স্ত্রী-কন্যা আছে, না ঢেঁকী আছে ! সে বেটা মিষ্টান্ন খায়, না ছাই খায় ! না করে একটুঁ স্ফূর্ত্তি—না পোষে দুটো মেয়েমানুষ—না খায় একটু নেশা। যাও—যাও—তুমি আমায় একটা আস্ত পশুর কাছে নিয়ে যেতে চাও হে ! সরে যাও বলছি,—আমি পুনরায় ধ্যানস্থ হবো, এর একটা হেস্ত-নেস্ত ক'রে ছাড়বো।

চর। বেটা ক্ষেপেছে রে।

[প্রস্থান]

চৈতন্য। দূর হ বল্‌ছি—নইলে তপো-তেজে ভস্ম করবো। [যুক্ত করে] হে চাকরী ! তবে এইবার এস,—এইবার তোমায় চিনেছি, তুমি এই দুগ্ধপোষ্য মাতৃহীন অভাগাদের মাসীমা ! তবে এস কলকণ্ঠময়ী বিশল্যকরণি—এস কটূক্তি-উদ্গারিণি ! একবার নিতম্ব ভারে হেলে দুলে প্রেমাধীনের নয়ন পথে উদয় হও—তোমার পদসেবা করতে করতে আমি ভব-লীলার অবসান করি।

কজ্জল পূরিত লোচন ভারে
স্তনযুগ শোভিত পর্ব্বতাকারে
অপমান লাঞ্ছনা মুদ্গর হস্তে
ভগবতী চাকরী দেবী নমস্তুতে।

[উপবেশন পূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ]

অন্যমনস্কভাবে তরলার প্রবেশ।

তরলা। এখন কোথায় যাই? গৃহে না শ্মশানে ? অসার পথে—না মৃত্যুর দেশে ?

চৈতন্য। [তরলার হাত ধরিয়া] এই পেয়েছি—পেয়েছি—পেয়েছি।

তরলা। কে তুমি পাষণ্ড? ওঃ—চৈতন্য! তুমি আবার এখানে? হাত ছাড়—হাত ছাড় পশু! আর কেন? এখনও তোমার সেই বিষাক্ত ছুরীর দাগ মিলায় নাই, আজও তার ঘা দগ্ দগ্ করছে! আবার আমার পাছে পাছে কেন? এখনও কি আশা মেটে নাই?

চৈতন্য। কে—তরলা? [হাত ছাড়িয়া দিল]

তরলা। হাঁ আমি তরলা।

চৈতন্য। আমি মনে ক'রেছিলুম চাকরী!

তরলা। [সবিস্ময়ে] চাকরী!

চৈতন্য। জান না, আমার যে রাজবাড়ীর অন্ন উঠেছে! তা আমি চাকরী মনে করে তোমার যে হাত ধরেছি;—তাতে ততটা অন্যায় হয় নাই। তুমি আমার চাকরীরূপা নিশ্চয়ই। তুমি যত দিন ছিলে—আমার চাকরীও অটুট ছিল! তোমারও পথ বন্ধ হয়েছে—আমিও ডাল ছাড়া বাঁদর।

তরলা। তোমার চাকরী গেছে?

চৈতন্য। হাঁ তরলা!

তরলা। [উল্লাসের সহিত] বাহবা—বাহবা! চৈতন্য! তবু তোমার চৈতন্য হচ্ছে না?

চৈতন্য। হাঁ তরলা একটু—একটু হচ্ছে!

তরলা। তবে এখনো কি করছো মূর্খ। সবাই আপনার আপনার পথ ধরলে—তুমি করছো কি পাগল?

চৈতন্য। করবো আর কি? করতাল হারিয়ে গাল বাজাচ্ছি।

তরলা। দেখ, তুমি এ পথ হ'তে ফেরো।

চৈতন্য। ফিরবো তরলা! এই একটা চাকরী জোগাড় হ'তে যা দেরী।

তরলা। চাকরী খুঁজছো?

চৈতন্য। খুঁজছি তো—পাচ্ছি কই?

তরলা। খোঁজবার মত খুঁজেছ?

চৈতন্য। এর চেয়ে যে আবার কি ক'রে খুঁজতে হয়, তাতো জানি না বাবা! সারাদিন না খাওয়া—না কিছু! এর দোকান—তার বাগান—ভট্চাজের ছাঁচতলা,—ঘোষেদের গোয়াল—তারা মামার বৈঠকখানা—চাঁদার মায়ের ঢেঁকশাল, এ আর কোথাও বাদ দিইনি।

তরলা। হায় মানব! এমন সোণার জীবনটায় চাকরী খুঁজে পেলে না?

চৈতন্য। কই—?

তরলা। চাকরী দিলে ক'রবে?

চৈতন্য। বলতো—বলতো! কোথায় কি ক'রতে হবে? তোমার অনেক জায়গায় যাতায়াত আছে—অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ আছে,—বলতো।

তরলা। চৈতন্য! তুমি শ্রীহরির পাদপদ্মে স্মরণ নাও।

চৈতন্য। ওঃ তুমি আমায় বৈষ্ণব ক'রতে চাও? সেটী হচ্ছে না। শেষে যে আমায় একতারা বাজিয়ে বাজিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করাবে, তা হবে না—একটা রাজা রাজড়ার চাকরী হয়তো করতে পারি।

তরলা। [স্বগত] ওঃ, তোমার অনেক বিলম্ব! লালসার নিম্ন স্তরে পোঁতা আছ। [প্রকাশ্যে] আচ্ছা, তোমার মনের মত একটী চাকরী আছে, তবে কিছু দূরে যেতে হবে।

চৈতন্য। কোথায়?

তরলা। বৃন্দাবন।

চৈতন্য। আরে চাকরীর জন্য আমি নরকে যেতে রাজী আছি। তা—ও চুলোর ছাই বৃন্দাবন! বলতো কার বাড়ী?

তরলা। শ্যামসুন্দর মহারাজের।

চৈতন্য। এইতো কথার মতো কথা! এই তো চাকরীর মতো চাকরী। যেমনি দেশের নাম, তেমনি মনিবের নাম!—একেবারে গাল ভরা। বলতো কি কর্ত্তে হবে?

তরলা। কিছু না—কেবল তার মনস্তুষ্টি।

চৈতন্য। তা, আমি তো তোষামোদে বেশ পটু আছি। আচ্ছা—পাওনা থোওনা—?

তরলা। যা চাইবে।

চৈতন্য। বটে! এতক্ষণ ব'লতে হয়! তরলা! তরলা! তুমি আমার যা উপকার ক'রলে—এতে তোমার চরণামৃত খেতে ইচ্ছে কচ্ছে। আমি আজই যাবো!

তরলা। হাঁ, যত শীঘ্র পার।

চৈতন্য। তা আর ব'লতে? তবে—কি নামটী ব'ললে?

তরলা। শ্যামসুন্দর মহারাজ!

চৈতন্য। আর ঐ বাড়ীটা ?

তরলা। বৃন্দাবন !

চৈতন্য। বৃন্দাবন—শ্যামসুন্দর মহারাজ ! কেয়াবাৎ চাকরী ! পেয়েছি বাবা—চাকরী পেয়েছি ! বৃন্দাবন—শ্যামসুন্দর মহারাজ ! কথাটা কাণে লেগেছে বাবা ! বৃন্দাবন—শ্যামসুন্দর মহারাজ !

[প্রস্থান]

তরলা। ঝাঁটা গাছটা নিজে তুচ্ছ অপবিত্র হ'লেও, যেখানটা ঝাঁট দেয় সেখানটা পবিত্র করে। যাও চৈতন্য ! এতে তোমার কিছু উপকার হ'লেও হ'তে পারে। এখন আমার উপায় ? জীবন তো একটা জীবন্ত মৃত্যু ! তবে মরি না কেন ? না—মরণেও বুঝি শান্তি নেই। একটা কিসের আবছায়া আলেয়ার মত আমার পিছু পিছু ছুট্‌ছে ; যেখানে যাব সঙ্গে সঙ্গে যাবে !

[উদাস ভাবে প্রস্থান]

সঙ্কর্ষণের হাত ধরিয়া গীত কণ্ঠে কজ্জলের প্রবেশ।

কজ্জলের গীত।

কেউ পারো ওরে ধরিতে, ওগো ঐ যায় দিবা সুন্দরী
ওযে গেল মিলায়ে নিশীথের কোলে এলায়ে শিথিল কবরী।
ওযে হাসিটুকু সব গায়ে মেখে যায় অমর তীর্থে করিতে স্নান
আঁচলে বেঁধেছে সবটুকু আলো রাখিয়ে বেসুরে ব্যথার গান।
ওরে ধরো নাগো কেউ, ধরিবে না কেউ ?
ধরা ঘেরে যে আঁধার শর্ব্বরী।

সঙ্কর্ষণ। সূর্য্য কি ডুবলো কজ্জল ?

কজ্জল। না, তবে আর বিলম্বও নাই। হায়—

সঙ্কর্ষণ। হায় ক'রো না, তবু অনেকটা সুখে আছি।

কজ্জল। সুখে? হায় অন্ধ! আজ যে দিনটা উপবাসেই কেটে যায়।

সঙ্কর্ষণ। যাক, তাও ভাল, তবু সুখে আছি, সংসার হ'তে দূরে দাঁড়িয়েছি তো? এই পরম লাভ।

কজ্জল। চল, তোমায় নিয়ে নগরের মধ্যে যাই।

সঙ্কর্ষণ। না কজ্জল! নগরে আর না—লোকালয়ে আর না—মনুষ্য সমাজে আর না।

কজ্জল। এ জায়গাটা বড় ভাল জায়গা, হিন্দুর পবিত্র তীর্থ।

সঙ্কর্ষণ। কোন্ জায়গা?

কজ্জল। প্রয়াগ।

সঙ্কর্ষণ। কজ্জল—কজ্জল! এত জায়গা থাক্‌তে তুমি আমাকে প্রয়াগে নিয়ে এলে কেন?

কজ্জল। তোমায় বেণীমাধব দর্শন করাতে।

সঙ্কর্ষণ। [হতাশ ভাবে] না কজ্জল! প্রয়াগে আর বেণীমাধব নাই। যদিও থাকে, সে একখানা পাথর! কজ্জল! বেণীমাধবই যদি প্রয়াগে থাকবে, তবে তার প্রয়াগের এ অবস্থা হয়? রক্ষক—ভক্ষক হয় কেন? স্ত্রী—স্বামীর ঘর করে না কেন? মানুষ—মানুষকে কাণা ক'রে কেন? না কজ্জল, ফিরে চল—ফিরে চল—অন্ততঃ প্রয়াগের গণ্ডী হ'তে ফিরে চল।

কজ্জল। পাগল! বেণীমাধব নাই কি? তোমাতে তুমি নাই, তাই ভেবেছ—প্রয়াগে বেণীমাধবও নাই। বেণীমাধবই যদি না থাকবে, তাঁর যদি বিচার না থাকবে, তাঁর যদি দয়া না থাকবে, তবে তুমি অন্ধ নিঃসহায়—আমি কোথাকার কে, তোমার হাত ধ'রে আগে আগে ছুটে মরি কেন?

সঙ্কর্ষণ। ঠিক ব'লেছ কজ্জল! জগতের আবর্জ্জনা আমি—কর্ম্মের

অনুতাপ আমি—ঈশ্বরের অভিশাপ আমি—আমি বেণীমাধবের মর্ম্ম কি বুঝবো? তবে কজ্জল! আমি অন্ধ, তাঁকে দেখবো কি ক'রে?

কজ্জল। আমি তোমায় দেখাবো।

সঙ্কর্ষণ। তা পারলেও পারতে পার! আমি তোমায় সামান্য ভাবি না। তুমি কাছে থাকলে একটা কি সুগন্ধে আমার প্রাণখানা ভ'রে উঠে। তুমি কথা কইলে আমার সকল স্মৃতি লোপ হ'য়ে যায়! তুমি হাত ধ'রলে, অন্ধ আমি—আমারও যেন কি একটা নূতন চোখ ফুটে ওঠে! তা তুমি পার! তবে কি জান কজ্জল! তোমার এই বেণীমাধব দেখ্‌তে আমার ততটা ইচ্ছে নেই।

কজ্জল। সে কি? বেণীমাধব দেখতে ইচ্ছা নাই কি? মানব জন্মে এ হ'তে কোন্ ইচ্ছা আর শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে? আশ্চর্য্য তুমি! বল অন্ধ! তবে তোমার কি দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়?

সঙ্কর্ষণ। ইচ্ছা হয়—একবার দেখি—একবার প্রাণ ভ'রে দেখি—আমার জন্মভূমি এই মাটীর স্বর্গ! তার ঢল ঢল কোমল গাত্রের উজ্জ্বল শ্যামলতা।—তার আকাশের অবাধ নীল প্রসার! ইচ্ছা হয় কজ্জল, একবার দেখি যে, সূর্য্য তেমনি ধারা খেলা করতে করতে ধেয়ে এসে মায়ের মুখ চুম্বন কচ্ছে কিনা—আর চন্দ্র আমার মাকে তেমনি ক'রে জ্যোৎস্নার জলে স্নান করিয়ে দিচ্ছে কিনা। পার—পার কজ্জল দেখাতে পার? তোমার বেণীমাধবের বদলে আমার বীণা-বাদিনী শ্যামা মাকে দেখাতে পার? একবার—একটী বার?

কজ্জল। না আজ আর বুঝি তা হয় না।

সঙ্কর্ষণ। আর তা হয় না। উঃ—কি স্বার্থপর তারা—যারা একজনকে চির-বঞ্চিত ক'রে এই বিশ্ব সৌন্দর্য্য একা ভোগ করে।

[চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল]

কজ্জল। ওকি অন্ধ! কাঁদছো কেন অন্ধ? দুঃখ কিসের অন্ধ? তোমার সব গেছে কিন্তু দেখ, আমি তোমার হ'য়েছি! দেখতে পাও না— তাতে কি? শুনতে তো পাও! আমি তোমায় শোনাবো ঐ মাতৃ সঙ্গীত—শোনাবো গীতার মর্ম্ম—শোনাবো বেদের ব্যাখ্যা—আর যদি দেখতে চাও তো দেখাবো সত্যের রূপ—বিশ্বাসের আনন্দ—আত্মার মিলন! আর সবার শেষে—সবার উচ্চে দেখাবো দয়ার এক অসীম সমুদ্র—যাতে এই বিশ্ব খানা ডুবে আছে।

সঙ্কর্ষণ। কজ্জল—কজ্জল! তোমায় প্রণাম ক'রতে ইচ্ছে হ'চ্ছে, কিন্তু কি ব'লে প্রণাম করি, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

গীতকণ্ঠে ভক্তির প্রবেশ।

গীত।

বল, সুন্দর চারু চন্দ্রমা, তুমি নন্দন ফুল সৌরভ,
বল, অন্ধের পথ সন্ধান, তুমি গন্ধের চির গৌরব।
নীল অম্বর চুম্বিত পদে, মুর্চ্ছিত ধরা শ্যাম সম্পদে,
মঙ্গল গীতি মুখর কণ্ঠ, পুর্ণিত আঁখি কল্যাণে,
বল, উজ্জ্বল কর কজ্জল কালো চর্চ্চিত যড় বৈভব॥

[প্রস্থান]

সঙ্কর্ষণ। ভগবান্! ভগবান্! তবু আমি ভাগ্যবান! আমার চোখ গেছে, কিন্তু কাণ যায় নাই।

চঞ্চলভাবে তরলার প্রবেশ।

তরলা। কে—কে? কার চোখ গেছে? কার চোখ গেছে? জগতে আবার কে অন্ধ! [দেখিয়া] একে! তাইতো! ওঃ! দয়াময়! এ আবার কি বিভীষিকা দেখাও প্রভু?

সঙ্কর্ষণ। কে কজ্জল ?

কজ্জল। কে জানে—একটা স্ত্রীলোক।

সঙ্কর্ষণ। স্ত্রীলোক –স্ত্রীলোক ! [চমকিয়া উঠিলেন]

তরলা। [প্রকৃতিস্থ হইয়া] হাঁ—স্ত্রীলোক ! চম্‌কে উঠ্‌ছো কেন ? ললাট কুঞ্চিত করছো কেন ?

সঙ্কর্ষণ। স্ত্রীলোক ! তা এখানে কেন ? রাজবাড়ী যাও না।

তরলা। না, তার ছাদ ভেঙে মাথায় পড়তে আস্‌ছে, তার প্রমোদোদ্যানের বিষাক্ত দুর্গন্ধে মানুষের দম আট্‌কে আসছে ! সেখানে যেতে পারবো না।

সঙ্কর্ষণ। নারী – নারী ! তুমি রাজবাড়ীর এত খবর জান, একটা সংবাদ বল্‌তে পার ?

তরলা। কি ?

সঙ্কর্ষণ। রাজার ভাই সেই লম্পট পুরু এখনও বেঁচে আছে ? এখনও সে লালসার ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে পারছে ? আর তার রক্ষিতাটা —যেটা একটা সাজানো ঘর ভেঙ্গে, একটা হৃদয় চুরমার ক'রে, একটা অসীম মহত্ত্ব পায়ে ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে নরকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেটা আজও চোখে দেখতে পাচ্ছে ?

[সঙ্কর্ষণের প্রত্যেক বাক্যে তরলা শিহরিয়া উঠিতেছিল]

তরলা। পাচ্ছে—পাচ্ছে অন্ধ ! এখনও পৃথিবীতে বজ্রপাত হয় নাই—এখনও আকাশে ঝঞ্ঝা দেখা দেয় নাই ; তবে বুঝি আর দেরীও নাই। [দুই হাতে মস্তক চাপিয়া ধরিল]

সঙ্কর্ষণ। ওকি ! ওকি নারী ! অত উত্তেজিত হ'চ্ছ কেন ?

তরলা। ওকি ! ওকি পুরুষ ! তুমি অত ইতস্ততঃ করছো কেন ?

সঙ্কর্ষণ। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার জীবন একটা বিরাট অন্ধকার!

তরলা। তোমার জীবনটাই অন্ধকার, আমার অন্ধকার আমরণ! তুমি চোখের কাঙাল, আমি কাঙাল হৃদয়ের।

সঙ্কর্ষণ। কে তুমি? কে তুমি মায়াবিনী?

তরলা। কে আমি? কে আমি তা বল্‌তেও পারবো না—তা বলবার উপায় নাই। যে কথা শুনলে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ উঠে যাবে, নিজের হাতে নিজের টুঁটী চেপে ধরবে—না—না—সে কথা বলবো না—সে কথা শুনো না।

সঙ্কর্ষণ। ভগবান্! তোমার দয়ার রাজ্যে আমায় একটু আপন মনে কাঁদতেও দেবে না? এ আবার কি দেখাচ্ছ পরমেশ?

কজ্জল। হ্যাঁ গা! তোমাদের বাড়ী এইখানে? দেখ, সারাদিন আমাদের কিছু খাওয়া হয়নি।

তরলা। কিছু খাবে?

কজ্জল। পেলে তো খাই।

তরলা। আচ্ছা আস্‌ছি, একটু অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান]

কজ্জল। ভাবছো কি অন্ধ? যেন তোমার মনে কোন আঘাত লেগেছে, না?

সঙ্কর্ষণ। না কজ্জল! তুমি কাছে আছ, আমার মনই আমাতে নেই।

ফল ও জল লইয়া তরলার পুনঃ প্রবেশ।

তরলা। এই নাও বালক! ফল এনেছি—জল খাও।

কজ্জল। আগে ওকে দাও।

তরলা। সে কি, তুমি খাবে না?

কজ্জল। আগে ওর খাওয়া না হলে, আমি কি খেতে পারি?

তরলা। তাই হোক্। [স্বগত] তবু আমি ভাগ্যবতী, তবু আমি ধন্য। জীবনে পতিভক্তি জানিনি, পতির সেবা করিনি, নারীধর্ম্ম মানিনি, যদি আজ সুযোগ পেয়েছি ছাড়ি কেন? [প্রকাশ্যে] অন্ধ! অন্ধ! জল খাও [হটাৎ বিচলিত হইয়া আপন মনে বলিতে লাগিল] কে—কে? উপরে কে তুমি আমার হাত ধরে টানলে? কি বললে? কি বললে? কুলটার আবার পতিসেবা? কুলটার আবার নারীধর্ম্ম? আমি জগতের অনিয়ম, জন্মের বিদ্রূপ, তাতে কি? [প্রকাশ্যে] নাও অন্ধ [ফল ও জল দিতে উদ্যত হইয়া, হটাৎ পিছাইয়া আসিয়া উর্দ্ধ দৃষ্টিতে বলিল] ও কি! তবু শুনবে না? আবার! কি বলছো? আমি অস্পর্শিয়া! ওহো হো হো, তাও তো বটে! ঠিক—ঠিক, আমার ছোঁয়া জল—ছি ছি ছি, উনি যে দেবতা! [কজ্জলের প্রতি] বালক—বালক! তুমি জল খাবে?

কজ্জল। সেতো অনেকক্ষণ বলেছি, ওর খাওয়া না হ'লে—

তরলা। তবে এই ফল তোমার সামনে আছড়ে দিলাম, এই জল তোমার পায়ে ঢেলে দিলাম। [ফল ও জল কজ্জলের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ]

কজ্জল। কর কি—কর কি? অন্ধ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর!

তরলা। বালক—বালক! আমি ব্রত নিয়েছি—অন্ধকে জল দেওয়া আমার নিষেধ।

[প্রস্থান]

কজ্জল। ছি ছি, করলে কি! পাগল নাকি! ফলটাও নষ্ট করলে, জলটাও আমার পায়ে ঢেলে দিলে।

সঙ্কর্ষণ। আমারও ক্ষুৎপিপাসা মিটে গেল কজ্জল।

কজ্জল। কই কিছুই তো খাও নাই।

সঙ্কর্ষণ। তোমার পায়ে ফল জল পড়েছে, বুঝি এইখানেই জগতের ক্ষুৎপিপাসার শেষ! চল কজ্জল, আমায় নিয়ে চল—

[কজ্জলের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রতিষ্ঠান—প্রাসাদ-কক্ষ।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সুহোত্র বাতায়ন পথে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে কেশিনী দণ্ডায়মান।

সুহোত্র। ওঃ, কি অন্ধকার রাত্রি! ঐ ঝড় উঠলো—কি ভীষণ! কি ভয়ানক! কেশিনী! প্রকৃতির এ দুর্য্যোগ কি মানুষের নির্ম্মমতার চেয়ে বেশী? ঐ বিদ্যুৎ, ওকি মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে তীব্র?

কেশিনী। রাত্রি অনেক হয়েছে, একটু ঘুমোও মহারাজ! তোমার অসুস্থ শরীর, এ রকম করলে পাগল হ'য়ে যাবে যে!

সুহোত্র। পাগল কি এখনও হইনি? হইনি কেন এই আশ্চর্য্য!

কেশিনী। অসুখটা বাড়াবে দেখছি।

সুহোত্র। আমার না হয় অসুখ করেছে—বাড়বে, কিন্তু রাণী! তুমি তো নীরোগ, কেমন সুখে আছো বল দেখি? বল—বল—ভ্রাতুষ্পুত্রের এই নির্ম্মমতা—এই বিশ্বাসঘাতকতা—বল—বল—

কেশিনী। আর ভেবে কি হবে মহারাজ! উপায় তো নেই।

সুহোত্র। উপায় নাই? উপায় নাই বল কি রাণী? আমি একজন পরাক্রান্ত সম্রাট, আজ বৃদ্ধ বয়সে পুত্র হারিয়ে—ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে

বন্দী! তুমি কি মনে কর, এটা কারও চক্ষে অন্যায় বলে ঠেক্‌ছে না? এর জন্য কেউ এক বিন্দু অশ্রুপাত করছে না? এর উপায় করতে কোনও দয়ালু কি তার অনন্ত শক্তির কণামাত্র মর্ত্ত্যলোকে পাঠাচ্ছে না? কেন রাণী! ঈশ্বর কি নাই? ঈশ্বর কি নাই? ওহো হো হো—

জহ্নুকে লইয়া গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। ঈশ্বর আছেন।

সুহোত্র। কে? গঙ্গা! দেবী!

গঙ্গা। হাঁ রাজা! এই দেখ তোমার পুত্র জহ্নু।

সুহোত্র। জহ্নু!

জহ্নু। পিতা—পিতা! আমি এসেছি আপনাকে মুক্ত করতে। পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করুন পিতা। আর আমি আপনাকে অসহায় ফেলে কোথাও যাবো না। পুত্রের প্রণাম গ্রহণ করুন পিতা।
[সুহোত্রকে প্রণাম করণ]

সুহোত্র। রাণি! জহ্নু আমায় প্রণাম করছে—জহ্নু ফিরে এসেছে! এ কি স্বপ্ন না সত্য?

গঙ্গা। না রাজা, এ সত্য! তোমাদের বন্দিত্বের সংবাদ পেয়ে, তোমাদের উদ্ধার করতে, তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্য করতে, কর্ত্তব্য-পরায়ণ পুত্র তোমার ছুটে এসেছে। নাও রাজা—পুত্রকে তোমার আশীর্ব্বাদ কর।

জহ্নু। মা! [মাতাকে প্রণাম করণ]

কেশিনী। আমায় আর তুই প্রণাম করিস্‌নি বাবা! তোকে আশীর্ব্বাদ করবার ভাষা কোথা খুঁজে পাই বল?

সুহোত্র। কর—কর রাণী, আশীর্ব্বাদ কর! আশীর্ব্বাদ কর ওকে,

যেন ওর পুত্র ব্রহ্মচারী হয়—বনে বনে ঘোরে, এই আমাদের মতনই ওকেও যেন কষ্ট দেয়।

জহ্নু। ক্ষমা করুন পিতা। আর আমি আপনাদের কাছ ছাড়া হবো না। আপনাদের প্রতি কর্ত্তব্যে অবহেলা করে আমি অপরাধ করে-ছিলাম। পিতা, আমায় ক্ষমা করুন।

পুরুমীরের প্রবেশ।

পুরুমীর। দাদা, দাদা, জহ্নু নাকি ফিরে এসেছে?

সুহোত্র। এসেছে—এসেছে! সে যে আমার পুত্র—পুত্র—আমি যে পিতা—আমার কাছে সেকি না এসে পারে? সে কি ভুলে থাকৃতে পারে? পুরু! পুরু! ভাই! আমি সেরে গেছি, আমার আর কোনো অসুখ নাই—কোনও অসুখ নাই।

গঙ্গা। পূর্ণ—পূর্ণ রাজা বাসনা তোমার।
আর এক অতীব সুখের বার্ত্তা
প্রদানি তোমায়!
পুত্র তব বিবাহিত বহুদিন।

কাবেরীর প্রবেশ।

গঙ্গা। ধর এই পুত্র-বধু,
গর্ভে তার বংশের দুলাল।
ঋণমুক্ত—ঋণমুক্ত তব পাশে আমি।

সুহোত্র। একি! একি! জহ্নু! এ কি সত্য!

[হর্ষ ও বিস্ময়ে জহ্নুর দিকে চাহিলেন]

জহ্নু। হাঁ পিতা! সত্য।

সুহোত্র। ওরে ওরে, আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না—এত

সুখ কি আমার ভাগ্যে সইবে? ওরে—দাঁড়া—দাঁড়া—তোরা দাঁড়া, আমার সামনে এসে দাঁড়া, আমি একবার দেখি, যতক্ষণ চোখ খোলা আছে, আমার লক্ষ ব্রতের ফল দেখি। পুরু, পুরু! যাও তো ভাই! তুমি নিজে যাও, প্রয়াগের সমস্ত দেব মন্দিরে পূজা দেবার ব্যবস্থা কর! যাও ভাই! দেরী করো না—আর শোন—মায়ের জন্য—মায়ের জন্য গোটা কতক ফুল এনো,—বেশ বাছা বাছা।

[পুরুমীরের প্রস্থান]

গঙ্গা। না রাজা, তোমার এক ফুলে আমার সব গেছে! তোমার জন্য আমি আমার পতির বিরাগ-ভাগিনী হয়েছি—আর না। বুঝতে পাচ্ছি ভৈরবের প্রতিহিংসা আমায় গ্রাস কর্ত্তে আসছে—তার রুদ্র দৃষ্টিতে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলবে! ঐ বুঝি অদূরে তার অশরীরী মুর্ত্তি, সেই মৌন গম্ভীর ভ্রূকুটি কুটিল মুখমণ্ডল, যেন তার মধ্যে কত বজ্র লুকান রয়েছে। সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অনল উদ্গার যেন বিশ্ব সৃষ্টির উপর প্রতিশোধ নেবে। পুড়তে হবে—পুড়বো, পুড়তেও প্রস্তুত রাজা! তোমার আর আশীর্ব্বাদ করতে পারলুম না—ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও।

[দ্রুত প্রস্থান]

সুহোত্র। মা মা! তাই তো, মা যে চলে গেল! কিন্তু কি বলে গেল—হেঁয়ালিতে কি বলে গেল কিছুই তো বুঝতে পারলুম না! ও—তা যাবে বৈ কি। এমনি মা, দানের প্রতিদান নিতে চায় না। [কাবেরীর প্রতি] বউ মা! চল তো মা প্রজাপুঞ্জের মুখ চেয়ে, আমার বুড়ো বয়সের মা হয়ে, পতির পাশে সগৌরবে সিংহাসনে একবার বসবে চল মা! আমিও আমার প্রাণ খানা গুছিয়ে নিই। শিবের দান, গঙ্গার দান, আর ঈশ্বরের অভয় দান, এই কটা দানকে আমি একটা তারে

বেঁধে নিই। [জহ্নু ও কাবেরীর হস্তধারণে উভয়কে সিংহাসনে বসাইতে উদ্যত হইলেন]

যোগাচার্য্য ও বদনের প্রবেশ।

যোগাচার্য্য। খুব তো দানের ছড়াছড়ি হয়ে গেল রাজা! এইবার যে প্রতিদানের পালা। [কাবেরী এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল]

সুহোত্র। কে তুমি সন্ন্যাসী?

যোগাচার্য্য। ওঃ, আজ চিন্‌তে পারবে না বটে! বেশীদিনের কথা না হলেও সে দিনে এ দিনে প্রভেদ আছে। রাজা! আমি সেই সন্ন্যাসী, যার প্রদত্ত চরুতে তুমি পুত্রবান—তোমার সংসার আজ সুখের হাট।

সুহোত্র। সন্ন্যাসী! আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমায় চিন্‌তে পারি নাই।

যোগাচার্য্য। যাক্—তাতে যায় আসে না। এখন, আমার কাছে যা প্রতিশ্রুত আছ, সেটা স্মরণ আছে তো?

সুহোত্র। তোমায় পুত্রদান! হা হা হা! এই কথা? ওতো দেওয়াই আছে সন্ন্যাসী।

যোগাচার্য্য। [দৃঢ় স্বরে] তাই যদি থাকে, তবে সন্ন্যাসী-পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে চলেছ কেন? ব্রহ্মচারীর পত্নী পুত্রের সাধ কেন? আর প্রদত্ত বস্তুতে তোমার আবার এত লোভ কেন?

সুহোত্র। [যোগাচার্য্যের কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া] কি বল্‌ছো সন্ন্যাসী?

যোগাচার্য্য। কি বল্‌ছি বুঝতে পারছো না? তুমি আমার কাছে প্রতিশ্রুত আছ, জ্যেষ্ঠপুত্রকে আমায় ইচ্ছামত দান করবে। সত্য পালন কর—পুত্র দাও।

সুহোত্র। দেখ সন্ন্যাসী! চুপ কর! আমার এমন শুভ লগ্নটায় অমন অকল্যাণকর চিৎকার করো না বল্‌ছি।

যোগাচার্য্য। কি সত্য ভঙ্গ কর্‌তে চাও? এখনও বল্‌ছি পুত্র দাও।

সুহোত্র। কে আছ হে, এ পাগলটাকে এখান থেকে বার করে দাও তো।

যোগাচার্য্য। [ক্রোধে চক্ষুদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল—গর্জ্জন করিয়া বলিলেন] স্তব্ধ হও প্রতারক! এই পাপে বিশ্ব মজাবে, সাবধান! এখনও মঙ্গল চাও তো পুত্র দাও।

[জহ্নু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁর মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল]

সুহোত্র। [ভয় বিকম্পিত কলেবরে যোগাচার্য্যের আপাদ মস্তক দেখিয়া] তাই তো! একি জ্বালাময় চক্ষু—ত্রিশূলে অগ্নি! সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী। আমি ভুল করেছি—আমায় ক্ষমা কর।

যোগাচার্য্য। বেশ, ভ্রম সংশোধন কর।

সুহোত্র। আমার যথা সর্ব্বস্ব নাও সন্ন্যাসী! বিনিময়ে—

যোগাচার্য্য। যথার মধ্যে তুমি, আর সর্ব্বস্বের মধ্যে তোমার রাজ্য—এই তো? আমি তার কাঙাল নই রাজা! আমি চাই—আমার যা তাই—তার বেশী না।

সুহোত্র। পায়ে ধরি সন্ন্যাসী! আমার সাজানো হাট ভেঙ্গো না।

[কাঁদিয়া ফেলিলেন]

যোগাচার্য্য। কেন? তাকে একবার ডাক! যে তোমার এই হাট সাজিয়ে দিয়েছে—ঋষিবাক্য ব্যর্থ ক'রেছে, সেই গর্ব্বিতা গঙ্গা আজ কোথায়? ডাক তাকে, হাট ভাঙ্গে যে, রক্ষা করুক।

সুহোত্র। সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী! সে অপরাধ আমার! আমিই তাঁর শরণাপন্ন হ'য়েছিলাম।

যোগাচার্য্য। কেন হয়েছিলে? সন্ন্যাসী বাক্য মিথ্যা—নয়? সন্ন্যাসীরা আজকাল চোর—তাদের বিভূতি চন্দন ভণ্ডামী, তারা ঠিক ক্ষত্রিয় রাজা গুলোর মত প্রতারক—না?

সুহোত্র। সন্দেহ হ'য়েছিল সন্ন্যাসী! রাজ্ঞী দ্বিতীয় চরুতে এক মৃত পুত্র প্রসব করেছিল।

যোগাচার্য্য। [সবিস্ময়ে] মৃত পুত্র?

সুহোত্র। হাঁ সন্ন্যাসী! সে পুত্রটী মৃত ছিল।

যোগাচার্য্য। মিথ্যা কথা! আমি দিব্য চক্ষে দেখছি—সে পুত্র জীবিত।

সুহোত্র। [সাগ্রহে] তবে এক কাজ কর সন্ন্যাসী! আমি তোমাকে পুত্র দানে স্বীকৃত আছি,—তুমি আমার সেই পুত্রটীকেই নিয়ে যাও।

যোগাচার্য্য। বৃদ্ধ! সে পুত্রে যোগাচার্য্যের কি উপকার হবে? চরু অনুসারে তার চরিত্র রাজকীয় দোষ গুণে গঠিত! আমি সন্ন্যাসী—চাই সন্ন্যাসী।

সুহোত্র। [অনুচ্চস্বরে] এ স্বপ্নাতীত! ত্যাগী সন্ন্যাসী কি এমন নিষ্ঠুর হ'তে পারে?

যোগাচার্য্য। পারতো না,—কিন্তু তুমিই তাকে নিষ্ঠুর ক'রে তুলেছ!

সুহোত্র। সন্ন্যাসী! মাথা পেতেছি—বজ্র হান! বুক দিচ্ছি - ত্রিশূল তোল! ভস্ম হবো—কালানল জ্বালো! পায়ে ধরি—তুষানল জ্বেলো না সন্ন্যাসী। [পদতলে পড়িতে উদ্যত]

যোগাচার্য্য। [গর্জ্জন করিয়া] সাবধান প্রবঞ্চক! অনুনয়ে উদ্যম ভাঙ্গবে না। পুত্র স্নেহ পরিত্যাগ কর।

সুহোত্র। যদি না করি?

যোগাচার্য্য। তাহ'লে তোমার মায়ার বাসর ফুৎকারে উড়িয়ে দেবো, পাপের সাম্রাজ্য কালাগ্নিতে ভস্ম করবো—আর তোমার এই বাৎসল্য লোলুপ মুগ্ধ দৃষ্টির সমক্ষে ত্রিশূলাঘাতে তোমার পুত্রের হৃদপিণ্ড উৎপাটন করবো। [জহ্নুর দিকে ত্রিশূল উত্তোলন করিলেন]

সুহোত্র। অহো—রাক্ষস! রাক্ষস! মায়াবী! পিশাচ! চ'—চ' আমায় নিয়ে চ', রাক্ষসের জায়গা হ'তে নিয়ে চ।

[কম্পিত কলেবরে কেশিনী সহ প্রস্থান]

জহ্নু। [উদ্দেশ্যে] পিতা! পিতা!

দুস্তর পরীক্ষা স্রোতে ফেলিয়া সন্তানে
যেওনা—যেওনা পিতা!
ব'লে যাও—কি কর্ত্তব্য মোর?

যোগাচার্য্য। জহ্নু—

জহ্নু। নীরব গগন কোল
নীরব নিখিল,
নীরব প্রকৃতি কণ্ঠ;
যেন এক প্রলয়ের সনে
মহা আলিঙ্গনে হইয়া সজ্জিত
জগৎ লয়েছে ব্রত মৌন নীরবতা।
হে সন্ন্যাসী! দয়া কর
ভাবিবার দাও অবকাশ।

যোগাচার্য্য। অবকাশ! ভাববার অবকাশ! কেন? পিতৃ-সত্য পালন—সে আবার ভাববার কথা?

জহ্নু। তবু! তবু হে সন্ন্যাসী!
নবীন সংসারী আমি।

কোথা ছিলে এতদিন ?
ঊর্দ্ধনেত্রে যবে
আকাশের দিকে ছিলাম চাহিয়া—
ছুটেছিনু পিপাসায় সারাটী জগৎ
দিয়েছিনু আত্মবলি ত্যাগের মন্দিরে,
কেন না চাহিলে ফিরে ?
হইত না কোনও বাধা,
হইতে না নিজে কলঙ্কিত !
আজ বড় অসময়ে ঋষি
সুধা কি গরল যদিও জানি না,
সংসার বাসনা তবু অতীব প্রবল।
দেখিব পিতার দয়া,
দেখিব মায়ের স্নেহ,
দেখিব পত্নীর প্রেম,
আত্মজের প্রীতি,
জগতের ভালবাসা দেখিব কেমন !
অবকাশ দাও ঋষি !
ভোগ করি কিছু দিন,
আশা মোর মিটে যাক্‌,
তারপর—

যোগাচার্য্য। [বিস্মিত হইয়া] তারপর ! এই কি শিব-অংশজাত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ জহ্নুর কথা ?

জহ্নু। সন্ন্যাসী ! অনেক কর্ত্তব্য ক'রেছি, উপস্থিত আমায় একটু

বিশ্রাম দাও—একটু শান্তি দাও ;—সংসার শয্যা যখন পেতেছি, একটু ঘুমুতে দাও।

যোগাচার্য্য। [ক্রোধে] ভুলে যাও সংসারের কথা,
ত্যাগ কর অতৃপ্ত বাসনা,
আলস্যের হেয় আবর্জ্জনা দূরে দাও—
যদ্যপি মঙ্গল চাও।
নতুবা রে নারকী তনয় !
বিশ্রাম দানিতে তোরে,
সুখ শয্যা পাতিছে শমন,
শাস্তি দানে এই দেখ গর্জ্জিত ত্রিশূল।

[ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া রুদ্র মূর্ত্তিতে দাঁড়াইলেন, তাঁহার ললাটে কালানল জ্বলিয়া উঠিল—কাবেরী শিহরিয়া উঠিল]

জহ্নু। [সভয়ে] কি ভীষণ !
কি ভীষণ সংহারী মূরতি !
নেত্র কোণে জ্বলে দ্বাদশ আদিত্য,
ত্রিশূলাগ্রে ঝরে উল্কা,
শান্ত হও হে সন্ন্যাসী।
ক্ষম অপরাধ, লুকাও দানবী মূর্ত্তি ;
আজ্ঞাবাহী দাস আমি,
বল কোথা যেতে হবে ?

কাবেরী। স্বামী ! স্বামী ! মহারাজ !

জহ্নু। হলো না—হলো না কাবেরী ! আর উপায় নাই ! দেখতে পাচ্ছ ঐ বিষ মাখা ভ্রুকুটী—ঐ বিদ্যুৎ গর্ভ ত্রিশূল ?

কাবেরী। আমি যে স্বামীর চরণে পুত্র উপহার দেবো কামনা ক'রেছি প্রভু !

জহ্নু। যা কিছু দেবার ঐ অগ্নির মুখে দাও !

কাবেরী। দেব ! দেব ! [যোগাচার্য্যের পদতলে পড়িল]

যোগাচার্য্য। ভুলে যাও বালিকা ! তোমার আশা যে ক্রমেই সীমা অতিক্রম ক'রছে ! আর কিছু প্রত্যাশা ক'রো না।

[কাবেরী সভয়ে এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন]

বদন। [অর্দ্ধস্বগত] আর বেলপাতা ছেড়ে বেলগাছ শুদ্ধ দিলেও বুঝি টলবে না।

জনৈক অনুচরের প্রবেশ।

অনুচর। [অভিবাদন পূর্ব্বক জহ্নুকে বলিল] মহারাজের আসন্নকাল উপস্থিত ; একবার আপনার সাক্ষাৎ চান।

জহ্নু। পিতার আসন্নকাল ? আমার পিতা ? তিনি তো এইমাত্র এখান হতে গেলেন।

অনুচর। পথে যেতে যেতেই তিনি এক প্রকার অবসন্ন হ'য়ে পড়েন। চলুন মহারাজ ! বিলম্ব ক'রলে আর দেখা হবে না।

জহ্নু। চল—চল, কোথায় তিনি ! [গমনোদ্যত]

যোগাচার্য্য। [বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে] দাঁড়াও—কোথায় যাচ্ছ ?

জহ্নু। যাচ্ছি,—যাচ্ছি সন্ন্যাসী—একটা দীপ নির্ব্বাণ দেখতে।

যোগাচার্য্য। কার আদেশে যাচ্ছ ?

জহ্নু। [আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যোগাচার্য্যের মুখের দিকে চাহিয়া] আদেশ ? আমার মুমূর্ষু পিতা, পুত্রের একবার শেষ সাক্ষাৎ চান্—এতে আবার আদেশ ?

যোগাচার্য্য। হাঁ আদেশ! কে তোমার পিতা? তুমি তো তাঁর দানীয় বস্তু! এখন যদি পিতা থাকতে হয়—তো সে আমি!

জহ্নু। আমি তো অস্বীকার করি নাই সন্ন্যাসী! তবু—তবু পিতা—জন্মদাতা পিতা—একবার চোখের দেখা—তাঁর এই শেষ সময়—দয়া কর—দয়া কর সন্ন্যাসী। [যোগাচার্য্যের পদপ্রান্তে পড়িয়া কাতর বচনে বলিলেন] আমায় একটীবার এক মুহূর্ত্তের জন্য মুক্তি দাও; আমি দেখা দিয়ে আসি।

যোগাচার্য্য। [অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন] রাজার নিকট এখন আছে কে?

অনুচর। মঙ্গলাচার্য্যের শিষ্য সৃঞ্জয়।

যোগাচার্য্য। যথেষ্ট! বৃদ্ধকে বলগে, এ জন্মে আর এ পুত্রের সাক্ষাৎ পাবে না। [অনুচর প্রস্থানোদ্যত হইল]

জহ্নু। তবে আর একটা কথা ব'লো—যে অস্ত্রে তিনি মরণের পথে ছুটেছেন, সেই অস্ত্রেই আমার সব দিক রুদ্ধ।

[অনুচরের প্রস্থান]

পুরুমীরের প্রবেশ।

পুরুমীর। আর ব'লতে হবে না কুমার। শুন্ছে কে? তোমার পিতা ইহধামে নাই।

জহ্নু। পিতা! পিতা! [মস্তকে হাত দিয়া রোদন]

যোগাচার্য্য। চুপ্! চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল আসতে পাবে না—মুখ হ'তে একটু অর্ত্তনাদ উঠতে পাবে না—হৃদয় খানায় একটা কম্পন হবে না। চলে এস— [জহ্নুর হাত ধরিয়া প্রস্থান]

[কাবেরী মুর্চ্ছিতা হইল]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চৈতন্যের বাটী।

খড়্গেশ্বরী।

খড়্গেশ্বরী। আরে আমার ভাতার! পয়সা নাই—কড়ি নাই—দু-খান গহনা নাই—পূজো-পার্ব্বণে একখানা ভাল কাপড় পর্য্যন্ত নাই, শুধুই আমার ভাতার! কেবল মুখের কথা বেচ্‌লেই যদি মেয়ে-মানুষ ঠাণ্ডা হতো, তাহলে কথক ঠাকুররা দেশের ভাতারের পদটা একচেটে ক'রে নিতো। আজ ঠিক ক'রেছি! ঝাঁটার চোটে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছি। চাকরী জোটাবে—তবে ঘরে ঢুকবে। আহা—হা, ভাতার তো ও পাড়ার বিন্দু দিদির, বছর বছর মাইনে বাড়ছে—কত জিনিষ আনছে—কত সখ মেটাচ্ছে! আমার যেমন পোড়া নেকন! দেখে শুনে সিঁদুর পরা ছেড়ে দিয়েছি,—পোড়া নোয়া গাছটা ফেললেই হয়।

চৈতন্যের প্রবেশ।

চৈতন্য। খড়্গা—

খড়্গেশ্বরী। বাড়ী ঢুকলে যে? বলি বাড়ী ঢুকলে যে?

চৈতন্য। কেন? আমি কি বাবার বাস্তভিটেটা বেচা কেনা করে গেছি?

খড়্গেশ্বরী। বেরোও বল্‌ছি বাড়ী হ'তে! এখনও ভাল চাও তো বেরোও, নইলে জানতো আমাকে?

চৈতন্য। তা আর জানি না? তুমি হচ্ছ যম রাজার সাক্ষাৎ পিসীমা! সেখানে বউগিন্নীর ঠ্যালায় কোন্দলে পশার জমাতে না পেরে, মনের দুঃখে বিবাগী হ'য়ে এখানে ছট্‌কে এসে পড়েছ।

খড়্গেশ্বরী। ওমা! আমি কুঁদুলী। যাবো কোথা! সমস্ত পাড়াখানার লোক বলে, খড়্গার তুল্য মেয়ে দেখা যায় না—মুখে রা-টী নেই! ওমা! কি ঘেন্না, আমি হলুম কুঁদুলী? তবে রে মুখপোড়া মিন্‌সে! দেখেছিস্ ঝাঁটা।

চৈতন্য। আরে রোস রোস, একটা কথা শোন।

খড়্গেশ্বরী। শুনবো কি? কানা কড়িটী রোজগার নেই, তার ওপর আমি কুঁদুলী—তার ওপর কথা শোনা! এ কেউ পারে?

চৈতন্য। আরে কথাটাই শোন না।

খড়্গেশ্বরী। বল, এক নিশ্বাসে বল! রাগে আমার মাথা ঘুরছে, আর দেরী সইছে না।

চৈতন্য। দেখ, আমার চাকরী হ'য়েছে।

খড়্গেশ্বরী। এঁ্যা এঁ্যা বল কি? সত্যি? হঁ্যাগা সত্যি? তা বেশ! কত মাইনে—কত মাইনে?

চৈতন্য। [স্বগত] বাবা, একেবারে মাইনের খবর। চাকরী চুলোয় না যমের বাড়ীতে তার খোঁজ নাই! [প্রকাশ্যে] দেখ খড়্গা! এর মাইনে নেই।

খড়্গেশ্বরী। ও মা, মাইনে নেই! সে আবার কি চাকরী গো? পেট ভাতে? না, ঝাঁটা বন্ধ রাখলে চল্‌লো না।

চৈতন্য। না খড়্গা, মাইনে নাই বটে, তবে যা চাইবো তাই দেবে।

খড়্গেশ্বরী। বটে, বটে! এমন চাকরী? তা এতক্ষণ বলতে হয়! যা চাইবে—তাই দেবে? বটে—বটে! তা হঁ্যাগা—একছড়া হার?

চৈতন্য। দেবে!

খড়্গেশ্বরী। একখানা বেনারসী—

চৈতন্য। তৎক্ষণাৎ—তথাস্তু!

খড়্গেশ্বরী। দেখ, যাই বলি আর যাই করি, আমি কিন্তু তোমায় বড্ড ভালবাসি।

চৈতন্য আ—হা—হাঃ! তা আর বাসবে না গো! আমার হাড়ে যে আজকাল হার তৈরী হচ্ছে, চামড়ায় বেনারসী ঝলমল ক'রছে—প্রাণ খানায় মলের বাদ্দি বাজছে! এতে আর ভাল না বেসে থাকা যায়? যাক্, আর বিলম্ব ক'রলে চলবে না—আমায় এখনই প্রবাসে যেতে হবে।

খড়্গেশ্বরী। এঁ্যা—প্রবাসে? বল কি? ওগো আমার যে কান্না পাচ্ছে গো! আমি কি নিয়ে থাকবো গো!

চৈতন্য। আরে—আরে—বিরহ এলো না কি?

খড়্গেশ্বরী। আসবে না? আমি যে তোমাবই কিছু জানি না গো।

চৈতন্য। তা আর জানি না? ও টাকার শ্রীমুখ দেখলেই বিরহ কেটে যাবে।

খড়্গেশ্বরী। তা দেখ, তা'হলে ওটা যত শীঘ্র পার পাঠিয়ে দিও।

চৈতন্য। তা হবে! এখন শীগগির শীগগির দু'টী আহারাদির ব্যবস্থা ক'রে দাও—অনেক দূর যেতে হবে।

খড়্গেশ্বরী। ঐ তো তুমি কাজ বোঝ না? আবার ওর যোগাড় যন্তর ক'রতে গেলে অনেক দেরী হ'য়ে যাবে; যাচ্ছ একটা শুভ কাজে না? ও কাজটা পথেই কোথাও কারও বাড়ীতে সেরো। না হয়, একদিন উপোসে কিছু মানুষ ম'রে যায় না।

চৈতন্য। তা বটে—তা বটে! তবে এই ধুলো পায়েই শ্রীহরি দুর্গা।

খড়্গোশ্বরী। দেখ, পিছু ডাকতে নাই। এক টা কথা কি—কোথায় কার বাড়ীতে চাকরী—আমায় বলে যাও! আমার যে ভাবনায় ঘুম হবে না! টাকা কড়ি আসতে দেরী হ'লে খবর নিতে হবে তো?

চৈতন্য। তা হবে বই কি! তা—তা—ঐ—যে গো—

খড়্গোশ্বরী। ঐ যে গো কি? খুলে বল!

চৈতন্য। তাইতো! জায়গাটা কি বলে দিলে মনে আসছে না যে! আঃ—আরে গেল যা—ঐ আস্‌ছে—আসছে না।

খড়্গোশ্বরী। ওঃ, তোমার সব ভণ্ডামী? না—আজ আর খাতির থাকলো না; আজ লঙ্কাকাণ্ড হবে।

চৈতন্য। আরে থাম,—আমায় মনে ক'রতে দাও।

খড়্গোশ্বরী। কর ব'লছি মনে—শীগগির কর! নইলে ঝাঁটায় রক্ত গঙ্গা ভগীরথ! মনে কর—মনে কর—ভাল চাওতো শীগগির মনে কর। নইলে আজ একেবারে শম্ভু নিশুম্ভু বধ।

চৈতন্য। দোহাই খড়্গা রক্ষা কর।

ভক্তি ও কজ্জলের প্রবেশ।

কজ্জল ও ভক্তি। ভিক্ষা পাবো মা?

চৈতন্য। ওগো কেগো তোমরা? সবাই মিলে এসে আগে বাবাকে ভিক্ষে দেওয়াও—

কজ্জল। কেন গা, তোমাদের কি হ'য়েছে?

চৈতন্য। আরে বাবা! আমার সব গেছে—সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি।

কজ্জল। কিছু চুরি গেছে?

চৈতন্য। ডাকাতি—ডাকাতি—এ বাবা দিনে ডাকাতি। কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না!

ভক্তি। কি খুঁজে পাচ্ছ না?

চৈতন্য। চাকরী—চাকরী। তোমরা একটু খুঁজে পেতে দাও না।

কজ্জল। আমরা তো চাকরীর সন্ধান জানি না, আমরা ভিখারী—মানুষ!

ভক্তি। তবে বলতো তোমাদের একটা গান শুনিয়ে দিতে পারি।

চৈতন্য। শোনাবে—গান শোনাবে? বেশ বেশ, তাই শোনাও।

খড়্গেশ্বরী। গান শোনাবে কি? এ দিকে সখ দেখ! পয়সা দেবে? ওরা কাঙাল ভিখারী, অমনি গাইবে কেন?

চৈতন্য। কেন গাইবে না? আমার এদিকে একটা এত বড় লোকসান হ'য়ে গেল, আর আমার বাড়ীতে এসে ওরা শুধু ফিরে যাবে? গাও গো—গাও—

ভক্তি। তবে শোন!

গীত

তুমি হে সকলে, সকল রূপে, সকলই বিকাশিত।
অধর তুমি, চুম্বন তুমি, তুমি যে প্রণয় পিপাসিত।
বারানসী ভূমে বিশ্বেশ্বর, তুমি ঈশ্বরী, তুমি ঈশ্বর।
বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর, প্যারীরূপে পুনঃ প্রকাশিত।

চৈতন্য। [আগ্রহাতিশয়ে জিজ্ঞাসা করিল] কি—কি বললে? তোমার গানের শেষটা কি আবার বলতো?

কজ্জল। তুমি বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর।

চৈতন্য। [উল্লাসে করতালি দিয়া] পেয়েছি—পেয়েছি খড়্গা! পেয়েছি।

খড়্গেশ্বরী। কি?

চৈতন্য। চাকরী—আবার কি? আমি আকাশ পাতাল খুঁজলে

পাবো কোথায় ? আমার চাকরী এদিকে এদের গানের মধ্যে ঢুকে ব'সে আছে গা ?

খড়্গেশ্বরী। গানের ভেতর চাকরী ?

চৈতন্য। ঐ শুনলে না—বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দরের বাড়ীতেই আমার চাকরী। [কজ্জলের প্রতি] আচ্ছা ছোকরা! তোমরা তো বেজায় চোর দেখছি।

কজ্জল। কি রকম ?

চৈতন্য। কি রকম নয় ? আমার এমন শ্যামসুন্দরের বাড়ীর চাকরীটা গোপন ক'রে রেখে দিয়েছিলে! যাও—তোমরা একজন ছেলেমানুষ আর একজন মেয়ে-ছেলে তাই ছেড়ে দিলাম—কিন্তু সাবধান। খড়্গা! তবে আসি! সব রইলো। অনেক দূর যেতে হবে! বৃন্দাবন—শ্যামসুন্দর!

কজ্জল। বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দরের বাড়ী যে চাকরী আছে, এ কথা তোমায় কে বললে ?

চৈতন্য। আরে যাও—যাও, বামাল বেরিয়ে গেছে, আর অত চালাকি কেন ?

খড়্গেশ্বরী। চালাকি কিসের ? ওদের পাঁচ জায়গায় যাতায়াত আছে, জানলেও জানতে পারে। তুমি যেমন মুখ্যু, কার দমে পড়েছ! [কজ্জলের প্রতি] হাঁগা বাছা! সেখানে কি চাকরী নেই ?

কজ্জল। চাকরী আছে, তবে সে লোকের চাকরী করা বড় কঠিন! পেটে না খেয়ে তার কাজ ক'রতে হ'বে!

খড়্গেশ্বরী। তা হোক্—তাতে ততটা যায় আসে না। তবে এদিককার বিষয় ?

কজ্জল। কই,—পয়সা কড়িও তো কাকেও দিতে দেখি না—বরং যদি কিছু থাকে, তাও আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করে।

খড়্গেশ্বরী। [চৈতন্যের প্রতি] শুনছো—শুনছো? বলি শুনছো? চাকরীর গরবেতে চোখে কাণে দেখতে পাচ্ছ না!

চৈতন্য। [অনুচ্চস্বরে] তাই তো হে, শেষে ঘরের হনুমান দিয়ে, রামযাত্রা হবে না কি?

ভক্তি। না মানব! ইতস্ততঃ করো না—বালকের হেঁয়ালিতে কাণ দিও না। তুমি ভাগ্যবান্, তাই তাঁর চাকরীর কথা তোমার কাণে উঠেছে, তাঁর দাসত্বে তোমার মন ছুটেছে! যাও—ছুটে যাও, বিলম্ব করো না। সেখানে অন্নাভাব নাই, মা অন্নপূর্ণা তাঁর দ্বারে বসে আছেন। সেখানে অর্থাভাব নাই—কুবের তাঁর কোষাধ্যক্ষ। যাও মানব! স্থানটা মনে এঁকে নাও—দিক ভ্রম হবে না; নামটা জপ করতে করতে যাও—জীবনে আর ভুলবে না; মন প্রাণ এক ক'রে ছুটে যাও—ফিরতে হবে না।

খড়্গেশ্বরী। ওগো তবে আর দাঁড়িয়ে কচ্ছ কি? যাও—শিগগীর যাও।

চৈতন্য। এই যাই—

খড়্গেশ্বরী। তোমরা দাঁড়াও গো, ভিক্ষে নিয়ে যাবে। আমি এদিকে যাই হই, কিন্তু আমার সামনে দিয়ে অতিথি ভিখিরী ফেরে না।

চৈতন্য। তা ফিরবে কেন? তোমায় তো আর এই দুপুর রোদে না খেয়ে বৃন্দাবন যেতে হয় না! তুমি বাড়ী ব'সে নেড়া নেড়ী নিয়ে আড্ডা মারবে বই কি।

খড়্গেশ্বরী। চল বাছা চল, ওর কথা শুনো না—ভিক্ষে নেবে এস।

[ভক্তি ও কজ্জল সহ প্রস্থান]

চৈতন্য। যা বেটী উচ্ছন্নে যা; আমি এই কলা দেখালুম! বাবা, তোমার পিরীত আমার চোখে বঁড়শীর মত ঠেক্‌ছে! এইবার তোমার

চার ঘোলালুম। জেনে রেখো চাঁদ! আর তোমার সে চৈতন্য নাই, এখন চৈতন্য চরিতামৃত। কি বল্‌লে? হাঁ—হাঁ—বৃন্দাবন শ্যামসুন্দর—বৃন্দাবন শ্যাম সুন্দর।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

যোগাচার্য্য, বদন ও দীন বেশে জহ্নু।
জহ্নু অনাহারী, তাঁহার দেহ অনাবৃত ছিল।

জহ্নু। [উদাসভাবে আপন মনে বলিতেছিলেন] একটা চমৎকার যুদ্ধ চল্‌ছে! জগৎ একদিকে—আমি একদিকে; শোক, সন্তাপ জ্বালা একদিকে—আমার হৃদয় একদিকে। সামনে দিয়ে প্রয়াগের রাজ-সংসারটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, আমি অনিমেষ নয়নে দেখলুম। আজ পক্ষকাল জঠরানল দাউ দাউ করে জ্বলছে, আমি শুদ্ধ হৃদয়ের রক্ত নিংড়ে তাকে নির্ব্বাণ করছি।

বদন। [যোগাচার্য্যকে বলিল] খেতে দাও বাবা! ওকে পেটে এক মুঠো খেতে দাও, ওর গায়ে একখানা বস্ত্র দাও।

যোগাচার্য্য। [বদনের প্রতি না চাহিয়া আপন মনে বলিলেন] পৃথিবী পাষাণ গলাতে একখানা করুণ সঙ্গীত ধরেছে, আমি কাণ দিচ্ছি না।

বদন। আজ চোদ্দদিন ওর পেটে একবিন্দু জল পড়ে নাই, তার উপর এই দুরন্ত শীত—অনাবৃত দেহ।

যোগাচার্য্য। [পূর্ব্ববৎ আপন মনে] আকাশ আর্ত্তনাদে আপনার মাথায় ঘা মারছে, আমি দেখেও দেখছি না।

বদন। কথা কচ্ছ না যে বাবা ?

যোগাচার্য্য। [পূর্ব্ববৎ] একটা প্রীতির কঙ্কাল আমার পায়ের তলায় ছট্‌ফট্ করছে, হা হা হা, আমি হাস্‌ছি।

বদন। খেতে দাও—শুনতে পাচ্ছ না ?

যোগাচার্য্য। [তদ্রূপভাবে] বাহবা—আমি।

বদন। বাঁচাও—দয়া হচ্ছে না ?

যোগাচার্য্য। [পূর্ব্ববৎ] বাহবা—আমি।

বদন। বাবা।

যোগাচার্য্য। কি ?

বদন। তোমার একটা ডাকাতের দল করলে হতো। মানুষ মারা ব্যবসা তো নিয়েইচো, তবে পয়সাগুলো আর ফাঁকে পড়ে কেন ?

যোগাচার্য্য। কথা ক'স না,—ভ্রুকুটী করিস না—টলাস না আমায়—শুধু দেখে যা।

বদন। আর যে দেখতে পারি না বাবা। চোখ দুটো কাণা করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

যোগাচার্য্য। শুধু তোর হচ্ছে ? আহ্বানের একটী ধ্বনিতে যার হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কার করে ওঠে; প্রার্থনার একটী কাকুতিতে যার মর্ম্মস্থল দ্রব হয়ে যায়; পৃথিবীর একটী দীর্ঘশ্বাসে যার চোখ দিয়ে শত ধারা ছোটে; তার কিছু হচ্ছে না ? কিন্তু কি করবো বাবা! উপায় নেই।

জহ্নু। [পূর্ব্ববৎ উদাসভাবে] তাই হোক, তাতে আমি কাতর নই। সিংহাসন হতে নামিয়েছ—নেমেছি, পরিচ্ছদ খুলিয়েছ—খুলেছি, সঙ্গে এনেছ—এসেছি। পিতার মৃত্যু চক্ষে দেখে, মাতার সতৃষ্ণ নয়ন

উপেক্ষা করে, পত্নীর অনুনয়ে আগুন জ্বেলে দিয়ে আমি তোমার সঙ্গে এসেছি। আর আজ অনাহার অনিদ্রায় তীক্ষ্ণশূলের সমক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবো না? খুব পারবো। যথা ইচ্ছা কর সন্ন্যাসী! একটা তিরস্কার করবো না, একবিন্দু চোখের জল ফেলবো না, তোমার পায়ের তলায় অম্লানে প্রাণ দেবো।

যোগাচার্য্য। [গর্ব্বভরে] এই তো জহ্নু।

বদন। না বাবা! তোমার যে উদ্দেশ্যই হোক্, আর আমার সহ্য হয় না। জহ্নু! তুমি আমার ভাই! তুমি আমি আজ এক বাপের ছেলে। ধর ভাই, ভাইয়ের দেওয়া এই ফল।

[ফল দিতে উদ্যত হইল]

জহ্নু। না ভাই, তা হবে না। আমি এসেছি পিতৃ-সত্য পালন করতে, বজ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, এই ভাবেই মরতে। জানতো ভাই! পুত্র-গতপ্রাণ পিতা আমার মুমূর্ষকালে একবার সাক্ষাৎ চেয়েছিলেন, যেতে পারতাম—যাই নাই। পিতৃ-আদেশ অমান্য করেছি—পুত্র ধর্ম্ম পায়ে ঠেলেছি—কেন জান? জগতের যত পাপ আমার মাথায় আসুক—আমার পিতার সত্য উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বল হোক। না ভাই, তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না।

যোগাচার্য্য। সাধু! সাধু!

জহ্নু। আর বিলম্ব নাই—ঐ বুঝি অন্ধকার সমুদ্রের দানবী তরঙ্গ—তরী ডুবলো। ঐ বুঝি মানব জীবনের শেষ স্পন্দন, মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু—

[অবসন্ন ভাবে পতনোন্মুখ হইলেন]

যোগাচার্য্য। [জহ্নুর হাত ধরিয়া] দূর হোক মৃত্যু! মৃত্যুঞ্জয় আমি।

জহ্নু। [যোগাচার্য্যের করস্পর্শে সঞ্জীবিত হইলেন এবং বিস্ময়োৎফুল্ল হইয়া বলিলেন] একি হলো! যেন এক কুটন্ত পদ্মের দল আমার

প্রকোষ্ঠ বেষ্টন করলে, যেন কোথাকার এক স্বপ্নরাজ্যের মধুর রাগিণী আমার কর্ণ মূলে অনাহত ধ্বনি করলে। কোথায় আমি? কোথায় আমি! [ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন]

যোগাচার্য্য। কি দেখছো?

জহ্নু। দেখছি—দিগন্ত-বিস্তৃত চির-বিনিস্তব্ধ মহাব্যোম; তার প্রত্যেক স্তর ভেদ করে ঝঙ্কারিত মধুময় এক মহান নাদ! আত্মা পরমাত্মায় আলিঙ্গন, এক চির জাগ্রত চির স্থির মহাজ্যোতি। [তাঁহার চাঞ্চল্য দূর হইল, তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইলেন]

যোগাচার্য্য। ওখানে ক্ষুধা আছে?

জহ্নু। না।

যোগাচার্য্য। পিপাসা?

জহ্নু। না।

যোগাচার্য্য। শীত?

জহ্নু। না।

যোগাচার্য্য। গ্রীষ্ম?

জহ্নু। কিছু না।

যোগাচার্য্য। তবে?

জহ্নু। আছে অনন্ত তুষ্টি—অবাধ বসন্ত—আত্মার প্রলয়।

যোগাচার্য্য। ঠিক! তবে এইবার দেখ তুমি কে? [জহ্নুর চক্ষুর নিকট স্বীয় হস্ত সঞ্চালন করিলেন]

জহ্নু। [শিহরিয়া উঠিয়া সবিস্ময়ে] তাই তো! তাই তো! এ আবার কি? আমি কে? আমি যে ঐ ব্যোমমণ্ডলসমাসীন আমিত্বশূন্য চিরমুক্ত জ্ঞানময় বিরাট পুরুষ। আমি যে ঐ উদ্বেলিত অনাহত ঝঙ্কৃত অনন্ত নাদ সমুদ্রে শায়িত নিত্য চৈতন্য। আমি যে ঐ উদ্ভাসিত

রশ্মিমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী মহামহিমময় ওঙ্কার রূপের মধুর বিকাশ। বায়ু-মণ্ডলে আমি, সৌর-মণ্ডলে আমি, ভুবন-মণ্ডলে আমি; সমাধিতে আমি, জাগরণে আমি, ভোগ ও ত্যাগে আমি; আত্মায় পরমাত্মায় আমি, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নায় আমি, মূলাধার হ'তে সহস্রারে আমি। তবে কে আমি? কে আমি? শিবোহহম—শিবোহহম!

যোগাচার্য্য। [জহ্নুকে ছাড়িয়া দিয়া ঈষৎ দূরে দাঁড়াইয়া বলিলেন] এইবার?

জহ্নু। [সহসা কি যেন হারাইয়া ফেলিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে] কই—কই! কোথায়—কোথায়! কি হলো—কি হলো! সে জ্যোতির স্তম্ভ চূর্ণ—আবার সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার—আবার সেই মহা ভ্রমের কোলাহল। গেলাম—গেলাম—রক্ষা কর—রক্ষা কর। [আকুল হইয়া উঠিলেন]

যোগাচার্য্য। ভয় নাই—ভয় নাই। তোমার অলক্ষ্যে অযাচিত ভাবে তোমায় রক্ষা করছে কে—দেখ—[অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন]

[সম্মুখে কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল]

জহ্নু। একি! একি! এযে ঘোরদ্রংষ্ট্রা, করালাস্যা বিস্ফুরিতাননা, ঘোররাবা, মহারৌদ্রী, বালার্কমণ্ডলাকার লোচনত্রয় সমন্বিতা, মুক্তকেশী চতুর্ভুজা মহাকালী!

যোগাচার্য্য। আবার দেখ—

জহ্নু। [তারা মূর্ত্তির আবির্ভাব] এ আবার কি? এযে জ্বলচ্চিতামধ্যগতা খর্ব্বা লম্বোদরী ব্যাঘ্র চর্ম্মাবৃতা ভীমা পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিতা, পিঙ্গল জটাজুটধারিণী মুণ্ডমালিনী করালিনী তারা!

যোগাচার্য্য। [ঊর্দ্ধে দেখ]

[ঊর্দ্ধে ছিন্নমস্তা অবির্ভূতা হইলেন]

জহ্নু। ঊর্দ্ধে কোটী সূর্য্য সমপ্রভা, দিগম্বরী ঘোরা, বামহস্তে স্বীয় ছিন্ন বিকট মুণ্ডধারিণী নিজকণ্ঠ বিনির্গত রক্তপানোন্মাদিনী, ডাকিনী যোগিনী অনুসৃতা, রতি কামোপরিস্থিতা ছিন্নমস্তা মহাদেবী!

যোগাচার্য্য। আবার দেখ—[অধোদেশে ধূমাবতীর আবির্ভাব]

জহ্নু। একি! এযে বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা মলিনাম্বরা কাকধ্বজ-রথারূঢ়া, বিধবা কুটিলেক্ষণা সূর্পহস্তা ক্ষুৎপিপাসাকাতরা কলহপ্রিয়া ধূমাবতী।

যোগাচার্য্য। অবশিষ্ট দিঙ্মণ্ডলে দেখ [অঙ্গুলী সঙ্কেতে সকল দিক দেখাইতে লাগিলেন]

[যথাক্রমে ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, বগলা
ও কমলা মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল]

[জহ্নু চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিলেন]

জহ্নু। বালার্ক কিরণোজ্জ্বলা, ষোড়শী শ্যামাঙ্গী শশীশেখরা ভুবনেশ্বরী! রক্তবস্ত্র পরিহিতা অক্ষমালিনী ভৈরবী! ধৃতমুদ্গর বৈরীজিহ্বা পীতবর্ণা বগলা! দন্ত খেটকপাশাঙ্কুশধারিণী মাতঙ্গী! সরসীরুহ সমাশ্রিতা কমলা! সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী! গুরু! গুরু! এ আমায় কোথায় আনলে?

যোগাচার্য্য। আনলাম জ্যোতির্ম্মণ্ডলে—আনলাম শক্তির সাধনা ক্ষেত্রে—আনলাম তোমার জহ্নুত্বের সম্মুখে—[সহসা বদন সহ অন্তর্হিত হইলেন]

জহ্নু। যেও না—যেও না গুরু! যদি আমায় জ্যোতির্ম্মণ্ডলে আনলে, যদি আমার সুপ্ত শক্তি পুনঃ জাগরিত করলে, যদি আমার অপহৃত জহ্নুত্ব ফিরে দিলে, তবে বলে যাও গুরু—এ আলোকে কি দেখবো? এ শক্তি নিয়ে কোন্ অসাধ্য সাধন করবো?

যোগাচার্য্য। [অন্তরীক্ষ হইতে] দর্প চূর্ণ কর।

জহ্নু। দর্প চূর্ণ করবো ? কার ?

যোগাচার্য্য। দর্পিতার।

জহ্নু। দর্পিতা ? কে সে দর্পিতা ?

যোগাচার্য্য। গঙ্গা—

জহ্নু। গঙ্গা ! ভুবন পালিনী—
মাতৃ-স্বরূপিণী গঙ্গা ?
ওঃ ঠিক—ঠিক হয়েছে স্মরণ
পড়িয়াছে মনে
সুযোগে কৌশল জাল করিয়া বিস্তার
গঙ্গা করেছিল বন্দী মোরে।
ব্রহ্মচর্য্য করিয়া হরণ,
ফেলেছিলো নরকের ঘোর অন্ধকারে !
করিব দমন আজ,—
দেবো শিক্ষা—
দেখাবো জগতে তার ভীম প্রতিশোধ !
গঙ্গা ! গঙ্গা ! শকতিদর্পিতা !
কত শক্তি ধর তুমি দেখিব এ বার !
ত্রিদিব কাঁপায়ে আজ করিব সাধনা।
ত্রিদিবের সর্ব্ব শক্তি একত্র করিয়া,
হরিব শকতি তব !
যতেক মাহাত্ম্যে তব
চির তরে কালিমা লেপিব।
নতুবা এ যোগাসনে সাঙ্গ মোর খেলা।

[যোগাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন]

অপ্সরাগণের প্রবেশ ও গীত।

গীত।

তাপসের তপ ভেঙ্গে দে, তপ ভেঙ্গে দে, তপ ভেঙ্গে দে সই
এলো চুলে জড়িয়ে নে লো, জটার বাঁধন ওই !
নারীর কোমল পরশ পেলে,
তপ ভেঙ্গে দে ছুটবে তাপস তপ, জপ, ফেলে।
ঐ আঁচল তলেই চলবে তখন চরম তপস্যা
পরম পদটী মিলবে সেথায় ঘুচবে সমস্যা।
আগম নিগম সবই হবে, সেই অতলে জলসই।

জহ্নু। কেরে—কেরে, যোগ ভঙ্গের করিস প্রয়াস ? দূর হ'রে—ধ্বংস হ'রে—মায়া মরিচীকা [অপ্সরাগণের দগ্ধ হইতে হইতে আর্ত্তনাদ]

ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। শান্ত হও—শান্ত হও জহ্নু—
ক্রোধ তব কর সম্বরণ।
না বুঝিয়া তপোবল তব,
অবোধ অপ্সরা কুল—
এসেছিল তপোভঙ্গ তরে !
শাস্তি তার হয়েছে সম্যক !
হের সৃষ্টি যায় রসাতলে।

জহ্নু। পদ্মযোনী—

ব্রহ্মা। রক্ষা কর সৃষ্টি জহ্নু।
সঞ্জীবিত কর এই অপ্সরার কুল।

জহ্নু। তবে তুমিও পূরণ কর
অভীষ্ট আমার।

ব্রহ্মা। নিষ্ঠুর অভীষ্ট তব।
ত্রিলোক-তারিণী গঙ্গা
চির কোমলতাময়ী,
তার প্রতি হেন অত্যাচার—
অসাধ্য আমার।

জহ্নু। বেশ, তবে যাও তুমি!
কোথা তুমি মহাবিষ্ণু!
দরশন দাও
পুরাও বাসনা মম।

বিষ্ণুর আবির্ভাব।

বিষ্ণু। অন্য বর চাহ যোগীবর!
মম অংশোদ্ভূতা গঙ্গা,
আদরিণী তনয়া আমার
মুছিতে হাসিটী তার।
আমি কি পারি গো কভু জনক হইয়া?
[প্রস্থান]

জহ্নু। কোথা তুমি দেবেশ শঙ্কর।
এস প্রভু! দাও বর।

অন্তরীক্ষে মহাদেবের আবির্ভাব।

মহাদেব। যা দেবার দিয়েছি রে আমি,
বর দিছি—শক্তি দিছি

তাহতে আমার—
শ্রেষ্ঠ দান কিছু নাই আর। [অন্তর্দ্ধান]

জহ্নু। বুঝিয়াছি দেব!
ছদ্মবেশে গুরুরূপে তুমি মহেশ্বর—
ঢেলেছ অনন্ত শক্তি হৃদয়ে আমার।
এস, কোথা দিকপালগণ
এস ত্বরা, হও মম অভীষ্টে সহায়।

দেবতাগণসহ ইন্দ্রের আবির্ভাব।

ইন্দ্র। কেন কুটিল পথে ভ্রান্ত মতিহীন,
অক্ষম—অক্ষম মোরা গঙ্গার দমনে।

জহ্নু। কি তোমরাও অক্ষম?

ইন্দ্র। সম্পূর্ণ অক্ষম মোরা এ ঘৃণ্য প্রস্তাবে।

জহ্নু। [ক্রোধ ভরে আসন হইতে উঠিয়া] একটা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পার না, একটা আশীর্ব্বাদে সামর্থ্য নাই—একটা অভয়বাণীর সাহস নাই? দেবতা শুধুই দেবতা। [ঘৃণাভরে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন]

সহসা গঙ্গার আবির্ভাব।

গঙ্গা। দেবতা—দেবতা।

জহ্নু। শোনা কথা গঙ্গা।

গঙ্গা। শোনা কথা নয় জহ্নু! যদি বর নেবে, মানুষের মত নত হও—ডাকার মত ডাক—চাওয়ার মত চাও; দেখবে, দেবতা—দেবতা।

জহ্নু। খুব দেখেছি গঙ্গা।

গঙ্গা। না, দেখনি! বেশ, বল জহ্নু! কি প্রার্থনা তোমার?

জহ্নু। [অবজ্ঞাভরে] কেন, তুমি পূর্ণ করবে নাকি ?

গঙ্গা। আমিও দেবতা, তোমারই আহূত ! বল জহ্নু ! কি প্রার্থনা তোমার ?

জহ্নু। [সবিস্ময়ে] আমার প্রার্থনা ?

গঙ্গা। হ্যাঁ বল জহ্নু !
কি প্রার্থনা তোমার ?

ব্রহ্মা। কাজ নাই জননী গো
ও কটু প্রার্থনা শুনে।
সমগ্র দেবতা মোরা হয়েছি স্তম্ভিত,
আছি স্থির প্রস্তর পুতুল প্রায় !
হায় মাগো !
ও যে ঘৃণ্য পশুর প্রার্থনা !

গঙ্গা। কিসের ভাবনা দেব !
জানে গঙ্গা ভাল মতে
পূর্ণিতে সে পাশব প্রার্থনা !
দুর্ম্মদ কামুক পশু ঐরাবত যবে
মাগিল শয়ন ভিক্ষা—
অবসর বুঝে—
জিহ্বা তাঁর করিনি ছেদন,
কহি নাই কটু ভাষ,
করি নাই রোষ গর্ভ একটী কটাক্ষ,
প্রার্থনা করেছি পূর্ণ—
নীতি শিক্ষা দানে।
আবার চলেছি টানে,—

দিও না ব্যাঘাত !
বল জহ্নু ! কি প্রার্থনা তব ?

জহ্নু। সাবধান গঙ্গা! জানতো, পিতার আরাধনায় বর দিয়ে তুমি আমার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করেছিলে ? এ সময়কার প্রার্থনা আমার কি হতে পারে, বেশ করে ভেবে দেখ।

গঙ্গা। যাই হোক্—ভাববার প্রয়োজন ? তুমি নর—আমি দেবতা। তুমি চোখের জল ফেলে আমার কাছে প্রার্থনা করবে—আমি হৃদয়ের রক্ত টস্‌টস্ করে নিঙড়ে দেবো, ; তুমি আমার পদপ্রান্তে এক একটী পুষ্প দেবে—আমি বুক হতে এক একখানা হাড় খুলে অম্লানে তোমার হাতে দেবো ; তুমি একবার একটী মুহুর্ত্তের জন্য প্রাণ গলিয়ে আমায় মা বলে ডাকবে,—আমি তোমার শত জন্মের সহস্র সন্তাপ অঞ্চলে মুছিয়ে নেবো।

জহ্নু। [অপাঙ্গে তাঁহার আপদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] উত্তম ! তবে দাও বর গঙ্গা ! আজ হতে গঙ্গার সমস্ত মাহাত্ম্য জগৎ হ'তে লুপ্ত হোক্।

গঙ্গা। তথাস্তু !

জহ্নু। তবে দাও বর গঙ্গা ! আজ হ'তে গঙ্গার সকল শক্তি আমাতে আসুক।

গঙ্গা। তথাস্তু।

জহ্নু। তবে দাও এই শেষ বর গঙ্গা। আজ হতে তুমি আমার আজ্ঞাবাহী দাসীরূপে অবস্থান কর।

গঙ্গা। তথাস্তু—তথাস্তু—তথাস্তু !
সঞ্জীবিত কর জহ্নু অপ্সরাকুল।

জহ্নু। হও সঞ্জীবিত,
মম ক্রোধে ভস্মীভূত যারা !

[অপ্সরাগণ সঞ্জীবিত হইল]

গঙ্গা। চলেছে ঘটনা স্রোত,
ভেসেছে বসুধা
দেবতার দান—নরের ধারণাতীত।

[চিন্তিত অন্তরে প্রস্থান]

ব্রহ্মা। অভাগিনী জননী আমার,
এই ছিল তোর ভালে ?

[সজল নয়নে প্রস্থান]

ইন্দ্র। হলো ধরা মরুভূমি !
মজিল প্রেমের সৃষ্টি।

[দেবগণ সহ প্রস্থান]

জহ্নু। কিছু নয়—কিছু নয়—
হয়েছি সংগ্রাম জয়ী
দর্পিতার হয়েছে দমন।

কজ্জলের প্রবেশ।

কজ্জল। না—না, হয় নাই জয়
পরাজিত তুমি।

জহ্নু। পরাজিত আমি !

কজ্জল। হাঁ পরাজিত তুমি।
লক্ষ কণ্ঠে ওই শোন উঠিতেছে রোল
সর্ব্বহারা রিক্তা গঙ্গা বিশ্বের পূজিতা।

জহ্নু। দাসী—দাসী গঙ্গা মম।

কজ্জল। দাসী—তবু মহিমা মণ্ডিতা,
ত্যাগের গরিমা দৃপ্তা, পূত আত্মদানে !

জহ্নু। কভু নয়—কভু নয়,
কভু তাহা হইতে দিব না।
চূর্ণিব গঙ্গার দর্প।
যদি হয় প্রয়োজন
আবার বসিব ধ্যানে
ধরা হতে করিব বিলোপ অস্তিত্ব গঙ্গার।

কজ্জল। নহে পরাক্রমে—
ত্যাগে যদি হতে পার গঙ্গার সমান
গঙ্গাদর্প চূর্ণ কথা ভেবো সেই দিন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গঙ্গার তীর

গঙ্গা-সঙ্গিনীগণের গীত।

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে!
অমল প্রবাহিনী শিবে শুভদায়িনী
পাতকী তারিতে নাচ' ভকতি তরঙ্গে।
করুণার দ্রবময়ী পূতধারা জননী,
নিবারিতে দুঃখ তাপ আসিলে এ ধরণী,
বিষ্ণু পাদোদ্ভূতা বরদে শুভদে মাতা
কামনা-কলুষ নাশ' রিপুদল সঙ্গে।

[প্রস্থান]

তরলার প্রবেশ।

তরলা। শুনি মাগো সুরধুনি!
পতিত-পাবনী তুমি;
আসি তাই অশিব-নাশিনী,
লয়ে এই পূজা অর্ঘ
ঢালিতে তোমার পায়।
কর মা উপায়,
চাহি না মুকতি আমি,
চাহি না পবিত্র হ'তে,
হর মা মর্ম্মের জ্বালা হররমা।

দাও মা স্বামীর চক্ষু
রাখ মা উজ্জ্বল কীর্ত্তি কীর্ত্তিময়ী গঙ্গে।

[বেদনায় তাহার চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল]

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। কে ডাকে? দীর্ঘশ্বাসের ঝড় তুলে, গঙ্গার বক্ষ কাঁপিয়ে, করুণ কণ্ঠে গঙ্গা ব'লে আবার কে ডাকে?

তরলা। এক ধর্ম্মহারা—সর্ব্বহারা নারী।

গঙ্গা। [স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং ঈষৎমৃদুহাস্যের সহিত আপন মনে বলিলেন] চমৎকার! সর্ব্বহারা নারী ডাকে এক হৃতসর্ব্বস্বা দেবীকে! নারী! বোধ হয় জান না যে, তোমার যা আছে, আজ গঙ্গার তাও নাই। [তরলার প্রতি] কি জন্য ডাকছো আমায় নারী?

তরলা। পূর্ণ করবে কি মা বাসনা আমার? আমি কে জান তো মা অন্তর্য্যামিনী—[কাঁদিয়া ফেলিল]

গঙ্গা। জানি, তুমি কলঙ্কিনী পতিতা। তাতে আমার কোন ক্ষতি ছিল না, আমিও ছিলাম পতিতোদ্ধারিণী। নারী! নারী! তাই কি আমায় ডাকছো? তোমার কলঙ্ক কালিমা ধৌত করতে গঙ্গাকে ডাক্‌ছো?

তরলা। না মা, সে জন্য তোমায় ডাকি নাই। আমি নরককুণ্ড হ'তে নন্দনের সৌরভে যেতে চাই না, কলঙ্কের দ্বার হ'তে পবিত্র আশ্রমে আশ্রয় চাই না। আমি চাই আমার অন্ধ স্বামীর চক্ষু।

[সাশ্রুনয়নে গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিল]

গঙ্গা। [বিচলিত হইয়া] অন্ধ স্বামীর চক্ষু?

তরলা। হাঁ, দাও মা, অন্ধ স্বামীর চক্ষু। জ্ঞানচক্ষুদায়িনী ত্রিনয়নি!

দাও মা, অন্ধ স্বামীর চক্ষু! পূজা অর্ঘ নাও—অশ্রুজল নাও—হৃদপিণ্ড নাও,—দাও মা—

গঙ্গা। ভুলে যাও নারী! আর সেদিন নাই। আজ আমি বড় দীনা! আর গঙ্গায় ডেকো না, গঙ্গার কাছে কেউ কিছু চেওনা, গঙ্গার নামে ক্ষীণ কণ্ঠেও একটী জয়ধ্বনি দিও না—ফল হবে না। প্রত্যাখ্যানের তীব্র বিষে তোমরাও জ্বলবে, আমিও জ্বলবো। আজ আর আমার কোনও শক্তি নেই।

তরলা। [সবিস্ময়ে গঙ্গার মুখের দিকে চাহিয়া] কি ব'ল্‌লে মা সর্ব্বশক্তিময়ী! তোমার আজ কোনও শক্তি নেই?

গঙ্গা। একটা আছে মা! সে শুধু আশ্রিতের গলা জড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে কাঁদবার। [স্নেহ-করুণ কণ্ঠে] আয় মা আশ্রিতা—আয় মা ব্যথিতা! মায়ের কাছে দুঃখ জানাতে এসেছিস—দু-ফোঁটা চোখের জল নে, আর কিছু নাই—আর কিছু পাবি না।

তরলা। তবে বল মা মহিমময়ী। তোমার সে শক্তি মহিমা—সে মহাশক্তি হরণ করলে কে? যে ক'রলে, সে এই বিশ্ব সংসারের করুণ আবেদন শুনতে পারবে তো?

জহ্নুর প্রবেশ।

জহ্নু। [সদম্ভে] অবশ্য পারবে! সে শক্তি তার আছে। [গঙ্গার প্রতি] তুমি এখানে কেন গঙ্গা?

গঙ্গা। এসেছি আর্ত্তের কাতরতায়—মর্ম্মভেদী আহ্বানে; কোনও কিছু দিতে নয়।

জহ্নু। সন্তুষ্ট হলাম। তবে এসেছ যদি আর্ত্তের কাতরতায়, বর দাও গঙ্গা। আমি তোমার সকল শক্তি—সকল পবিত্রতা ফিরিয়ে দিচ্ছি।

গঙ্গা। না, যা দিয়েছি, তার জন্য আর হাত পাত্‌বো না।

জহ্নু। তবে জেনে রেখো গঙ্গা, আহ্বানে উপস্থিত হবারও তোমার অধিকার নেই।

গঙ্গা। দুঃখ নাই; তবে বলে যাই, প্রকৃত শক্তি যদি চাও—যে যা চায়,—দাও।

[প্রস্থান]

জহ্নু। সর্ব্বস্ব হারিয়েছে, তবু যেন একটা কিসের গর্ব্ব উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হ'য়ে ফুটে বেরুচ্ছে। ওঃ বুঝেছি—এ ত্যাগের গরিমা! আচ্ছা—এ গর্ব্বেরও সমাধি শীঘ্রই হবে—তবে আমি জহ্নু। [তরলার প্রতি] বল নারী, কি তোমার প্রার্থনা?

তরলা। আমার অন্ধ স্বামীর চক্ষু।

জহ্নু। অন্ধ স্বামীর চক্ষু? ওঃ তুমি নিজেই তাকে অন্ধ ক'রেছ?

তরলা। তবে বুঝেছ কে আমি? কি কলুষিত জীবন আমার যদি জেনেছ অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ! তবে বল অভাগিনীর এ আশা কি পূর্ণ হবে না?

জহ্নু। তুমি যে কর্ম্ম করেছো নারী! অমন শত গঙ্গা সহস্র বর্ষ ধৌত ক'রেও সে কলঙ্কের কণামাত্র মুছে দিতে পারবে না। তবু যখন আমার সকাশে প্রার্থনা জানিয়েছ, উপায় একটা ব'লে দিতে পারি, কিন্তু বড় কঠোর পারবে কি?

তরলা। কলঙ্কিনী নারীর অসাধ্য কি? যতই কঠোর হোক—বলে দাও দেব! আমি পারবো।

জহ্নু। তবে যাও নারী! হিমাচলের পাদমূলে আমারই আশ্রম পার্শ্বে এক দুর্জ্জয় রাক্ষস বাস করে, তার চক্ষু দানের শক্তি আছে; তাকে সন্তুষ্ট করগে।

তরলা। [শিহরিয়া উঠিয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বলিল] রাক্ষস! চক্ষুদান! এ কি বুক কাঁপে কেন? [আত্মসম্বরণ করিয়া] না—না—দৃঢ় হ, তুই কলঙ্কিনী! বল দেব! কি উপায়ে তাকে সন্তুষ্ট করবো?

জহ্নু। সে রাক্ষস অন্য উপায়ে তৃপ্ত হবে না, এক জীবিত মনুষ্যকে তার আহাররূপে দিতে হবে।

তরলা। আমার জীবন আহুতি দেব।

জহ্নু। না নারী! পতিতার কলুষিত মাংস সে ভক্ষণ করবে না! তোমার অন্য কেউ থাকে তো নিয়ে যাও—নতুবা উপায় নাই।

তরলা। অন্য কেউ! অন্য আর আমার কে আছে! রাক্ষসের মুখে ধ'রে দেবার মত আর কে আছে? [ভাবিয়া] ওঃ আছে—আছে! কিন্তু—এ আবার তোমার কি পরীক্ষা বিশ্ব পরীক্ষক! এ আবার তোমার কোন্ নাটকের ক্রূর অভিনয়? পারবো না—পারবো না,—পতিতা—পতিতাই থাক, স্বামী সাত জন্ম অন্ধ হয়ে থাক,—তা পারবো না—তা পারবো না—তা পারবো না!

[উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় প্রস্থান]

জহ্নু। পারতেই হবে নারী; এ ছাড়া অন্য উপায় নাই।

শশব্যস্তে চৈতন্যের প্রবেশ।

চৈতন্য। [সবিনয়ে] একটু বিদ্যে দিয়ে যাও তো বাবা! একটু—ফোঁটাকতক! আমি তোমার পাঠশালায় ভর্ত্তি হতে এসেছি।

জহ্নু। কে তুমি?

চৈতন্য। আগে ছিলাম চৈতন্য—এখন ঘুরে ঘুরে অচৈতন্য হবার যোগাড়।

জহ্নু। চৈতন্য! এখানে? [আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন]

চৈতন্য। একটু বিদ্যের জন্যে বাবা! শুনেছি তোমার জাহাজ ভরা বিদ্যে, একটু দাও—করে খাই।

জহ্নু। বুঝিয়ে বল!

চৈতন্য। আর বাবা বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, দাঁত ভোঁতা হয়ে গেল, জিভ খাটো হ'য়ে গেল। চাকরীর চেষ্টায় বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর মহারাজের কাছে, পথে যেতে যেতে একটী কালো ছোকরার সেখানে দেখা হলো, সে নাকি শ্যামসুন্দর মহারাজের আত্মীয়, সে বললে তুমি মিছি মিছি সেখানে যাচ্ছ, শ্যামসুন্দর মহারাজ ভারি লম্পট, নিজে বিষয় আশয় কিছু দেখে না, যা কিছু দেখা শোনা সব তাঁর প্রধান কর্ম্মচারী কাশীর বিশ্বেশ্বর মশাই ক'রে থাকেন। ছুটলুম তাঁর কাছে, সেখানে গিয়ে দেখি, তিনিতো ভোল ফিরিয়ে যোগাচার্য্য হয়েছেন, ধরলুম তাঁকে—তিনি বললেন, কতদূর লেখাপড়া শিখেছ; আমি বললুম—বাবা, আমি তো লেখাপড়া জানিনে। তখন তিনি বললেন—লেখাপড়া জানা না থাকলে এ বিভাগে তো চাকরী হবে না, তুমি যাও গুরু ধর, জহ্নুর কাছে যাও, তার অনেক বিদ্যে জানা আছে। তাই এসে পড়েছি বাবা। চাকরী নিয়ে তবে কাজ। শেখাও বাবা গুরুমশায়, একটু চাকরী করার বিদ্যে শেখাও তো বাবা। চাকরী হলে সুদ সমেত তোমার মাইনে মেটাবো।

জহ্নু। তোমার চাকরীর কি প্রয়োজন চৈতন্য?

চৈতন্য। আ—হা হা। কচি খোকাটীর মত কথা কইলে চাকরীর কি প্রয়োজন? প্রয়োজন কিছু অর্থ রোজগার, আমার কিছু অর্থ—অর্থ—অর্থের প্রয়োজন।

জহ্নু। যদি তোমায় আশাতীত অর্থ দান করি?

চৈতন্য। হা—হা—হা! তা হ'লে আর চাকরীতে কি দরকার?

আর এই বুড়ো বয়সে গুরু ধরে ক, খ, শিখেই বা কি লাভ ? যে প্রকারেই হোক টাকা নিয়ে কথা।

জহ্নু। ধর—এই খনিত্র। [একটী খনিত্র চৈতন্যের হস্তে প্রদান]

চৈতন্য। কি করতে হবে বাবা ?

জহ্নু। এই স্থান খনন কর।

চৈতন্য। দেখাই যাক বাবা! অর্থই ওঠে—না চাকরী বিদ্যেই ওঠে—না কেউটে সাপই ওঠে।

[বৃক্ষতল খনন করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় রাশীকৃত স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া, খনিত্র ফেলিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল]

জহ্নু। কি দেখছো ?

চৈতন্য। এ কি ! এ যে রাশীকৃত স্বর্ণ মুদ্রা।

জহ্নু। আরও খনন কর।

[চৈতন্য পুনরায় খনন করিতে লাগিল ও হীরকখণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইল]

জহ্নু। এবার কি দেখছো ?

চৈতন্য। এ যে অগণিত হীরকখণ্ড।

জহ্নু। আরও নিম্নে যাও।

[চৈতন্য আবার খনন করিতে লাগিল এবং জহ্নুর ইচ্ছাশক্তিতে তথায় মণিমুক্তা প্রবালাদি উত্থিত হইল, চৈতন্য নির্ব্বাকে অনিমেষ নেত্রে রত্নের দিকে চাহিয়া রহিল]

জহ্নু। এবার ?

চৈতন্য। চিনেছি, চিনেছি বাবা! আমার নিজের না থাকলেও আমি অনেক দিন রাজবাড়ীতে কাটিয়েছি। এ সব জিনিষ দেখেছি। এ যে মণি মুক্তা প্রবালের ছড়াছড়ি। এ কি—এখানে এ সব কি ?

জহ্নু। আশ্চর্য্য হচ্ছ ?

চৈতন্য। বল—বল জহ্নু! এ সব কার ?

জহ্নু। আগে ছিল আমার, এখন তোমার। তুমি ইচ্ছামত গ্রহণ কর, আমি দান কর্চ্ছি।

চৈতন্য। তামাসা রাখ।

জহ্নু। তামাসা নয়—সত্য। দান গ্রহণ কর।

চৈতন্য। দান, দান ? বল কি ? দান ? [আশ্চর্য্যান্বিত হইল]

জহ্নু। হাঁ দান।

চৈতন্য। এ সব রত্ন কেউ কাকেও দান করতে পারে ?

জহ্নু। অন্যে না পারে, কিন্তু যে এক অমূল্য রত্নের অধিকারী হতে পেরেছে—সে পারে ; তার কাছে এ সব রত্ন তুচ্ছ।

চৈতন্য। [জহ্নুর মুখপানে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল] না, মাথা ঘুরে গেল! প্রাণ বিগড়ে গেল। পাগল করলে—আমায় পাগল করলে। রইলো তোমার স্বর্ণমুদ্রা—রইলো তোমার হীরকখণ্ড—রইলো তোমার মণিমুক্ত। বল—বল সাধু! বল মহাপুরুষ! কি সে অমূল্য রত্ন ? যা লাভ করে তুমি এই রাজ-বাঞ্ছিত মহার্ঘ রত্ন দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছ ? বল, বল, আমি তাই চাই।

জহ্নু। সে রত্ন—ত্যাগ ; সে রত্ন—তুষ্টি ; সে রত্ন—তোমারই ঐ শ্যামসুন্দরের একটু আভাষ।

[প্রস্থান]

চৈতন্য। শ্যামসুন্দরের আভাষ! না আমায় পাগল করলে—আমায়

পাগল করলে—এই শ্যামসুন্দরই আমায় পাগল করলে—শ্যামসুন্দর—শ্যামসুন্দর !

[প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে ভক্তির প্রবেশ।

গীত।

বল ভুবন মণ্ডল হরিবোল,
তোল ভুবন মণ্ডলে হরিবোল—হরিবোল।

চৈতন্য। কে মা তুমি ?

ভক্তি। আমি ভক্তি ! তোমার হাত ধরে নিতে এসেছি শ্যাম-সুন্দরের রাজ্যে। তিনি আমায় পাঠিয়ে দিলেন—সেখানে তোমার চাকরী হয়েছে।

চৈতন্য। হয়েছে ! হয়েছে ? আমার চাকরী হয়েছে ? শ্যামসুন্দরের রাজ্যে আমার চাকরী হয়েছে ? তবে নিয়ে চল—নিয়ে চল মা আমায় শ্যামসুন্দরের চরণপ্রান্তে।

ভক্তির গীত।

বল ভুবন মণ্ডল হরিবোল,
তোল ভুবনমণ্ডলে হরিবোল,
এমন পড়ে পাওয়া নেশায়
জীবনখানা মাতিয়ে তোল,
ওঃ তোর ফাঁকা কাজে
ফাঁকা কথায় বাধলো বিষম গণ্ডগোল।
তুই এই বেলা নে গুছিয়ে আপন
খোল মনের দুয়ার।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রম।

উন্মাদিনীর ন্যায় কনককে লইয়া তরলার প্রবেশ।

তরলা। কনক।

কনক। মা! একি মা! তোমার কণ্ঠস্বর এত কর্কশ কেন? আমায় কোথায় নিয়ে চলেছ মা?

তরলা। কনক! আমি তোর কে?

কনক। তুমি আমার মা।

তরলা। না—না—আমি তোর মা নই! আমি তোর—

কনক। না মা—না মা, অমন করে তুমি আমায় ভয় দেখিও না মা! আমার বড্ড ভয় হচ্ছে মা—বড্ড ভয় হচ্ছে।

তরলা। [কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া] যার মা জগতের ভয়, তার ছেলে এত দুর্ব্বল? আচ্ছা কনক, আমায় মা বলে ডাকতে তোর লজ্জা হয় না?

কনক। কেন মা তুমি কুল-ত্যাগিনী বলে? তাতে আমার কি? আমার চক্ষে তুমি পবিত্র, আমার কাছে তুমি পূজ্য, আমার তুমি সেই স্নেহময়ী মা! মা! তুমি নারী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়েছ, কিন্তু তোমার মাতৃধর্ম্ম তো বলি দিতে পার নি মা।

তরলা। [বিচলিত হইয়া] মাতৃধর্ম্ম! মাতৃধর্ম্ম! ওঃ! [দৃঢ়তার সহিত] কনক! আজ যদি আমি ঐ মাতৃধর্ম্মও বিসর্জ্জন দিই?

কনক। ক্ষতি কি! আমি আমার পুত্রধর্ম্ম রাখবো।

তরলা। [উল্লাসে উর্দ্ধদৃষ্টিতে বলিলেন] ভগবান! ভগবান! তোমার পতিতার তালিকা হ'তে তরলার নাম মুছে দাও! আমি পতিতা

নই, পতিতার কখনও এমন মাতৃভক্ত পুত্র হয়? তবে কনক! পুত্রধর্ম্ম রাখবি?

কনক। রাখবো।

তরলা। সত্য?

কনক। বল মা! তুমি কি চাও?

তরলা। [স্বগত] কি চাই, বলে ফেল্—বলে ফেল রাক্ষসী! দেরি করিস না, [illegible] বল, গুছিয়ে বল! হাঁ এই তো চাই। [প্রকাশ্যে] তবে শোন ক[illegible] আমি চাই—আমি চাই তোর জীবন।

কনক [illegible] আমি দেবো! জীবন নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত হয়েছি! তার সার্থকত[illegible] পাই না। তাকে কাজ দিতে পারি না! আজ পেয়েছি, আজ তু[illegible]-পূজায় ব্রতী করবো। এই নাও মা—নাও জননী—তোমার [illegible] জীবন—[বক্ষ পাতিয়া বসিল]

তরলা। এ ভাবে নয়—এ ভাবে নয় কনক। সৃষ্টির অতীত প্রথায় তোর জীবন নিতে হবে, মাতৃত্বের চরম পরাকাষ্ঠায় তোকে মারতে হবে। তোর জীবন নিয়ে আর একটা জীবনে রং ফলাতে হবে।

কনক। সে আবার কি মা?

তরলা। তবে শোন কনক! আমার বিবাহিত অন্ধ স্বামী আজও বেঁচে আছে। আমি নিজেই তাকে অন্ধ করেছিলাম। আজ তার চক্ষু চাই। শুনলুম জহ্নুর আশ্রমে এক রাক্ষস বাস করে, তার চক্ষুদানের শক্তি আছে, তবে আগে তার আহারোপযোগী এক জীবিত মানুষ চাই।

কনক। [শিহরিয়া উঠিল] তাই কি আমার কাছে এসেছ মা?

তরলা। আর আমার কে আছে, কার কাছে যাবো কনক? আমি মা—তুই ছেলে। কথা রাখবি, তাই তোর কাছে এসেছি। কনক! তোকেই এই রাক্ষসের ভক্ষ্যরূপে দিতে চাই।

[কনক উৎফুল্লনেত্রে তরলার আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল]

তরলা। কি দেখছিস্ ?

কনক। দেখছি—দেখছি মা ! তোমার মহিমামণ্ডিত ললাট, দেখছি মা তোমার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময় মুখমণ্ডল ! কে বলে তুমি কুলটা ! জগজ্জননী সতী সীমন্তিনীর জ্যোতিঃ তোমার মুখমণ্ডলে।

তরলা। না—না, জ্যোতিঃ নয়—জ্যোতিঃ নয় ! এ ললাটে শুধু কলঙ্কের রেখা দপ্‌দপ্ করছে, এ মুখমণ্ডল শুধু বিদ্যুৎজ্বালায় ছেয়ে আছে।

কনক। নিয়ে চল মা, আমায় নিয়ে চল, সিংহ গুহায় হোক, রাক্ষস কবলে হোক, বজ্রপাতে হোক, যথা ইচ্ছা নিয়ে চল, কোনও দ্বিধা নাই। মরবার আগে জেনে গেলাম, আমি বিশ্বমাতৃকার সন্তান, জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর কোলে আমার স্থান।

তরলা। [বক্ষে লইয়া] কনক—কনক !

কনক। চল মা।

[উভয়ের প্রস্থান]

স্বঞ্জয় ও মঙ্গলাচার্য্যের প্রবেশ।

স্বঞ্জয়। বল আচার্য্য ! আমায় এ বেশে, এ সময়ে এখানে আন্‌লে কেন ?

মঙ্গলাচার্য্য। বল স্বঞ্জয়—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা।

স্বঞ্জয়। এ আবার তোমার কি প্রহেলিকা আচার্য্য। চির নিদ্রিতের জাগরণ কেন ? জন্মনীতি বহির্ভূত এক জলবিম্বের আবার পিতৃ-প্রণাম কিসের ?

মঙ্গলাচার্য্য। বল সৃঞ্জয়! পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ—

সৃঞ্জয়। বল আচার্য্য! এ আবার তোমার কোন বৈচিত্র্যময় অদ্ভুত রহস্য?

মঙ্গলাচার্য্য। [ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন] বল সৃঞ্জয়! পিতা স্বর্গঃ—

সৃঞ্জয়। [এবার একটু ভীত হইলেন, মঙ্গলাচার্য্যের মুখপানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন]

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা।

মঙ্গলাচার্য্য। সৃঞ্জয়! মহারাজ সুহোত্রকে মনে পড়ে?

সৃঞ্জয়। সে কি আচার্য্য! এই সবেমাত্র সেদিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলাচার্য্য। তাঁর আকৃতি স্মরণ হয়?

সৃঞ্জয়। হয়।

মঙ্গলাচার্য্য। বেশ, তবে এইবার মনোমধ্যে সেই মূর্ত্তি ধ্যান করতে করতে ঐ পিতৃ প্রণাম মন্ত্র পুনরায় উচ্চারণ কর।

সৃঞ্জয়। বল আচার্য্য! বল আচার্য্য! মহারাজ সুহোত্র আমার পিতা?

মঙ্গলাচার্য্য। হাঁ।

সৃঞ্জয়। পিতা! পিতা! গ্রহণ কর এই অভাগার শ্রদ্ধাঞ্জলী—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা।

আচার্য্য, মহারাজ সুহোত্র আমার পিতা! মহারাণী কেশিনী আমার গর্ভধারিণী জননী; এ কথা আমায় আগে বলনি কেন আচার্য্য?

মঙ্গলাচার্য্য। সময় হয় নি!

সৃঞ্জয়। সময় হয় নি?

মঙ্গলাচার্য্য। না, আগে জানলে, তোমার মৃত্যু হতো।

সৃঞ্জয়। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না আচার্য্য।

মঙ্গলাচার্য্য। আজ তোমায় সবই বুঝিয়ে দেব সৃঞ্জয়; তাই তোমাকে এখানে এনেছি।

সৃঞ্জয়। মহারাজ সুহোত্র আমার পিতা, মহারাণী কেশিনী আমার মাতা? এ কথা জানলে আমার মৃত্যু হ'তো?

মঙ্গলাচার্য্য। সৃঞ্জয়! তোমার পিতা দেহ রক্ষা ক'রেছেন; আগামী অমাবস্যা পর্য্যন্ত তোমার মাতারও জীবন কাল।

সৃঞ্জয়। সেকি আচার্য্য?

মঙ্গলাচার্য্য। হ্যাঁ। তোমার কোষ্ঠীর ফল এই যে—পিতা ও মাতা কাকেও তুমি জীবিত অবস্থায় চিন্তে পারলে, তখনি তোমার মৃত্যু ঘটবে। তাই তোমাকে রক্ষা করবার জন্য এতকাল তোমার পরিচয় গোপন রাখতে হয়েছে।

সৃঞ্জয়। অদৃষ্টের একি পরীক্ষা আচার্য্য? পার্থিব জগতের সাক্ষাত দেবতা পিতা মাতার চরণ বন্দনা করতে পেলুম না? যদিও আজ মাতৃ পরিচয় পেলুম, কিন্তু মাতৃ নামে তাঁকে আহ্বান করবার পুর্ব্বে তাঁকেও হারাতে হবে? আচার্য্য! এ ধিক্কৃত জীবনে আমার কি প্রয়োজন ছিল?

মঙ্গলাচার্য্য। দুঃখ করো না সৃঞ্জয়, যদিও পিতা মাতা বলে চিন্‌তে পারোনি, তথাপি—পিতার মৃত্যু কালে সন্তানের অধিক সেবা করে তুমি ধন্য হ'তে পেরেছ। তাঁরাও তোমাকে পুত্রাধিক স্নেহে আশীর্ব্বাদ করে গেছেন। এই সৌভাগ্য টুকুর জন্যেই বিধাতাকে ধন্যবাদ দিও। শোন সৃঞ্জয়! ক্লৈব্যের সময় এ নয়, গুরুতর কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে। জহ্নুর অবর্ত্তমানে প্রয়াগ রক্ষার ভার তোমার! তোমারই মাতা গঙ্গার আদেশ,

যতদিন না জহ্নুর পুত্র জন্ম গ্রহণ ক'রে উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তুমিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে প্রয়াগকে রক্ষা করবে। তোমার পিতাকে মা আমার বর দিয়েছিলেন—প্রয়াগ রক্ষা করবার। সে বর উদ্‌যাপনের ভার মায়ের পুত্র তোমার।

সৃঞ্জয়। পার্থিব মাকে কখনো চিনিনি। যাঁর দয়ায় আমি আজও জীবন ধারণ করছি, সেই জগদ্‌বাঞ্ছিতা আমার মায়ের আদেশ পালন ক'রতে, এই আমি এখনই প্রয়াগ যাত্রা করলাম গুরু।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

মঙ্গলাচার্য্য। আমার আশীর্ব্বাদ তোমায় রক্ষা কর্ব্বে বৎস।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

জহ্নুর আশ্রম পার্শ্ব।

জনৈক রাক্ষস প্রফুল্ল মনে কনকের মুণ্ড চর্ব্বণ করিতেছিল, তরলা সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল তাহার দৃষ্টি স্থির, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অচল।

তরলা। [অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে বলিল] চক্ষু দাও—চক্ষু দাও—চক্ষু দাও।

রাক্ষস। আঃ বিরক্ত ক'রো না—খেতে দাও। [পূর্ব্ববৎ চর্ব্বণ করিতে লাগিল]

তরলা। একটু পরে খাবে, আগে আমায় বিদায় কর—আমায় সরিয়ে দাও—দাও স্বামীর চক্ষু দাও।

রাক্ষস। [অর্দ্ধস্বগত] আঃ, কি সুস্বাদ! কি কোমল।

তরলা। তা হবে না? ওযে এক জনের হৃদপিণ্ড—ওযে মায়ের বুক গালাই ক'রে তৈরী! দাও—দাও—চক্ষু দাও।

রাক্ষস। এ্যাঁ—চক্ষু!

তরলা। হাঁ—চক্ষু! ও রকম অবাক হ'চ্ছ কেন?

রাক্ষস। [পূর্ব্ববৎ] চক্ষুতো আমি দিতে পারবো না।

তরলা। [যেন আকাশ হইতে পড়িল] এ্যাঁ, বল কি? দিতে পারবে না কি?

রাক্ষস। না নারী, সে ক্ষমতা আমার নেই।

তরলা। নেই? সে ক্ষমতা তোমার নেই? রাক্ষস! রাক্ষস! তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হয় নি!

রাক্ষস। কি করবো নারী!

তরলা। রাক্ষস! ছলনা করো না। তোমার পায়ে ধরি। দেখ, এ আমার কি ভয়ানক মুহূর্ত্ত।

[ব্যাকুল হইয়া রাক্ষসের পদতলে পড়িল]

রাক্ষস। [উত্তেজিত হইয়া] পা ছাড় নারী—

তরলা। চক্ষু দাও!

রাক্ষস। পা ছাড় নারী—

তরলা। চক্ষু দাও!

রাক্ষস। দূর হও [তরলাকে ঠেলিয়া দিয়া প্রস্থানোদ্যত]

তরলা। [রাক্ষসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দিয়া] কোথা যাবে? জেনো রাক্ষস, আমিও কিছু তোমা অপেক্ষা কম নই! তুমি মানুষ

খাও—আমি নিজের ছেলে খাই—নিজের রক্ত নিজে পান করি—ছিন্ন-মস্তা আমি।

রাক্ষস। ও, তাহ'লে তুমি চক্ষু চাও না, মৃত্যু চাও?

তরলা। বাঃ রাক্ষস! তুমি তো বুদ্ধিমান মন্দ নও দেখছি। আর তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ চললো না। এবার নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করি। [নিজের বক্ষে ছুরিকা বসাইতে উদ্যত]

রাক্ষস। [তরলার হস্ত ধরিয়া বাধা দিয়া] স্থির হও নারী! আত্মহত্যা ক'রো না, উপায় করছি। দেখ, চক্ষু নিতে হ'লে এখনও আর একটা কাজ তোমায় ক'রতে হবে।

তরলা। [আশ্চর্য্য হইয়া] কি? এরপর অন্য কাজ আর সংসারে কি আছে?

রাক্ষস। সেও বড় সামান্য নয়।

তরলা। তাহ'লে বল—বল—শীঘ্র বল।

রাক্ষস। দেখ, আমার কাছে এক দুগ্ধ আছে দিতে পারি। এর আশ্চর্য্য গুণ এই, অন্য কারো চক্ষু নিয়ে যদি এই দুগ্ধের দ্বারা যথা-স্থানে বসানো যায়, তাহ'লে পূর্ব্ববৎ চক্ষু হয়।

তরলা। [আহ্লাদে] তোমায় প্রণাম করি রাক্ষস। দাও—দাও—দাও—দুগ্ধ দাও।

রাক্ষস। [তরলাকে দুগ্ধ পাত্র দিয়া বলিল] নাও, কিন্তু চক্ষুর উপায়?

তরলা। সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি আর এ চোখ দুটো নিয়ে কি করবো?

রাক্ষস। তা হবে না নারী! তবে আর ভাবছি কেন? এর নিয়ম এই, এই দুগ্ধ নিয়ে যাবার সময় পথে যে মানবের সঙ্গে প্রথম

সাক্ষাৎ হবে,—যে প্রকারেই হোক্, তার চক্ষু চাই, অন্য চক্ষে হবে না। পারতো দেখ—আর আমার হাত নাই।

[প্রস্থান]

তরলা। [কিয়ৎক্ষণ দুগ্ধপাত্র হস্তে নির্ব্বাক স্থির দাঁড়াইয়া রহিল—পরে] এ আবার কি? ছবির পর ছবি, নরকের পর নরক! রাক্ষস! রাক্ষস! এ আমায় কোথায় নিয়ে চলেছ? আমার স্বামীর জন্য আমি পুত্র দিতে পারি, সব ক'রতে পারি, কিন্তু একি? কার পাপে কে মরে? না না, তোমার এত বিচার কিসের তরলা? তুমি উপপতির কোল হ'তে উঠে এসে, স্বামীর দিকে লক্ষ্য ক'রে ছুটেছ! কে রইলো—কে গেলো, অত ভাবনা কিসের? বাজ পড়ুক, উল্কা জ্বলুক, প্রলয় হোক্—যে ভূমিকায় নেমেছ তরলা, অভিনয় কর—কে কোথায় আছ স'রে যাও।

[প্রস্থানোদ্যতা]

জহ্নুর প্রবেশ।

জহ্নু। কে? কে ছুটে চলেছ তুমি—উন্মাদিনী নারী?

তরলা। এসেছ? তুমি!! পালাও—পালাও—স'রে যাও—পালাও—

জহ্নু। পালাবো কেন?

তরলা। তবে এসো চক্ষু দাও। [ছুরিকা বাহির করিল]

জহ্নু। চক্ষু দেব—কেন?

তরলা। আমার সেই অন্ধ স্বামীর জন্য।

জহ্নু। বাঃ আমার চক্ষু নিয়ে তার কি হবে?

তরলা। তার চক্ষু হবে।

জহ্নু। হা—হা—হা। এ কথা তোমায় কে বল্‌লে?

তরলা। রাক্ষস।

জহ্নু। রাক্ষস!

তরলা। নিজের পুত্রকে তার আহার রূপে দিয়েছি। কিন্তু সে চক্ষু দেয় নাই, এই দুগ্ধ দিয়েছে। বলে দিয়েছে, যাবার সময় প্রথম দৃষ্টিতে যে পড়বে, তার চক্ষু নিয়ে এই দুগ্ধের দ্বারা অন্ধের চক্ষে বসাতে হবে। উপদেষ্টা তুমি,—তুমিই পড়েছ।

জহ্নু। [চমকিয়া উঠিয়া আপন মনে] এ আবার তোমার কোন্ পরীক্ষা ছলনাময়! আমি ত্যাগের পরীক্ষা দেবার জন্য গঙ্গাকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করেছি, তাঁর কাছে পরীক্ষা দেবো—অন্যের কাছে নয়।

তরলা। ভাবছো কি ত্যাগী?

জহ্নু। ভাবছি নারী, তোমার এতটা পরিশ্রম সব বুঝি বিফল হলো।

তরলা। তাকি হয়? আমি তোমার কথায় ছেলের মাথা খেয়েছি, আর রাক্ষসের কথায় তোমার মাথা খেতে পারবো না? তবে দেখ— [ছুরিকা তুলিয়া অগ্রসর হইল]

জহ্নু। সাবধান।

তরলা। [সভয়ে পিছাইয়া] একি। একি! কে এ? চক্ষে উল্কা—বাক্যে বজ্র! [জহ্নুর পদতলে পড়িয়া] মহাপুরুষ! মহাপুরুষ! আমার উপায় কি?

জহ্নু। যাও নারী! তুমি পুনরায় সেই রাক্ষসের কাছে যাও। বলো, যে লোক তোমার দৃষ্টিতে পড়েছে, এমন সাত জন্ম তপস্যা করলেও, তার চক্ষু পাবার উপায় নাই। সে রাক্ষসও বড় সামান্য নয়, অবশ্য বুঝবে, অন্য পন্থাও করবে।

[তরলার প্রস্থান]

জহ্নু। [কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া]
কিন্তু, কিন্তু এই কি রে তোর ত্যাগ ?
দেখাবো গঙ্গারে ত্যাগের পরীক্ষা,
পরাঙ্মুখ অন্য জনে ?
ত্যাগে চলে পাত্রাপাত্র ভেদ ?
না—না, নারী ! শোন নারী।

তরলার পুনঃ প্রবেশ।

কিন্তু, কিন্তু,—কে সে অন্ধ—
কত মুল্যবান্ জীবন তাহার !
আমি কেন তবে নিজ প্রাণ
দিই বলিদান তার তরে ?
[তরলাকে] যাও যাও নারী
তুমি রাক্ষস সকাশে। [তরলার প্রস্থান]

জহ্নু। বুঝিতে না পারি এ কার চাতুরী।
[ক্ষণপরে] ওকি ! ওকি !
অলক্ষ্যে কাহার জ্যোতিঃ স্নিগ্ধ নিরমল ?
ছাইল হৃদয়তল,
দূবে দিল ভেদাভেদ ঘোর অন্ধকার !
বাঁশী গায় আত্ম-বলিদান
বাঁশী গায় সাম্যের সঙ্গীত
বাঁশী গায় ত্যাগ ;
কি সুন্দর মরি—মরি !
নারী—নারী—

তরলার পুনঃ প্রবেশ।

জহ্নু। দাও তব শাণিত ছুরিকা

[তরলার হাত হইতে ছুরিকা গ্রহণ করিয়া স্বীয় চক্ষু উৎপাটনে উদ্যত]

সহসা কজ্জলের প্রবেশ।

কজ্জল। [জহ্নুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাধা দিয়া] ওকি! ওকি! তুমি করছো কি?

জহ্নু। কে—কে তুমি বালক আমায় বাধা দিলে? কে তুমি মহা-বিস্ময়? তোমার হাত বাধা দিচ্ছে, কিন্তু তোমার চক্ষু ইঙ্গিত করছে। তোমার ছলনা বল্‌ছে ফের, তোমার মহিমা বলছে—এগোও।

কজ্জল। [বাধা দিয়া] কিন্তু—কিন্তু এটা ঠিক হচ্ছে না।

জহ্নু। না না বালক! বাধা দিও না ভুল হয়ে যাবে।

[চক্ষু উৎপাটন]

ধর—ধর নারী! এই তোমার সাধনার পুরস্কার।

[তরলার হস্তে চক্ষু প্রদান]

তরলা। একি! একি! ধন্য তুমি—ধন্য আমি—আর ধন্য আমার স্বামী।

[প্রস্থান]

জহ্নু। [স্বগত] বংশী! বাজরে—নীরব কেন?

আর যে দুন্দুভি-রব লাগে না রে ভাল,
আর যে আশার কণ্ঠে নাই সে মাধুর্য্য,
ঢালে কর্ণে হলাহল,
সংসারের কটু কোলাহল।

বাজা বাঁশী, বাজা সে রাগিণী,

বাজ তুই প্রাণ ভরে, অন্ধ আমি শুনি।

কজ্জলের গীত।

তবে বাজ্‌রে আমার বিরাগ-বাঁশী।

অনুরাগে উঠে নেমে ছড়িয়ে দে ভালবাসাবাসি।

গা' বাঁশী সাম সঙ্গীত, দেখা বাঁশী ষড় দর্শন,

তালে তালে হ'ক্ গীতার ব্যাখ্যা, সমে হ'ক্ সুধা বর্ষণ,

ছড়াক্ সে ধ্বনি কাণে কাণে,

ছুটুক্ বিজলী প্রাণে প্রাণে,

কর্ম্ম, ভক্তি, আত্মজ্ঞানে হয়ে যাক্ তিনে একরাশি।

[জহ্নুর হস্ত ধারণ]

জহ্নু। কি মধুর স্পর্শ! কি দিগন্তভরা সৌরভ! কি অমিয়পূরিত ধ্বনি! এ যে বেদের গান, এ যে ফুলের ঘ্রাণ, এ যে সর্ব্ব-অনুভূতির সমষ্টি আনন্দময় এক মহাধ্যান! [আবেশে হৃদয় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।]

সঙ্কর্ষণ চক্ষুষ্মান হইয়া ব্যাকুলভাবে কজ্জলকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল।

সঙ্কর্ষণ। কজ্জল! কজ্জল! কৈ কজ্জল? কোথা কজ্জল?

কজ্জল। কেন—কেন? এই যে—এখানে।

সঙ্কর্ষণ। এখানে—এখানে কেন? এসো—এসো আমার বুকে এসো।

কজ্জল। না, আর আমি তোমার কাছে যাবো না।

সঙ্কর্ষণ। কেন কজ্জল! আমি তোমার কি করেছি?

কজ্জল। তুমি তো আমায় চাও নাই, চেয়েছিলে চক্ষু,—চেয়েছিলে

দেখ্‌তে তোমার জন্মভূমি, তা হ’য়েছে। আজ তুমি তোমার নিজের দেখে নিতে পার্‌বে। যতদিন তুমি অন্ধ ছিলে, তোমার হাত ধ’রে ছুটে বেড়িয়েছি। এই দেখ, আজ আবার আমি নূতন অন্ধ পেয়েছি। আর আমি তোমার নই।

সঙ্কর্ষণ। [রোরুদ্যমান হইয়া বলিল] আর তুমি আমার নও? কি? আর তুমি আমার নও?

কজ্জল। বুঝ্‌তে পার নাই মানব! এ কজ্জল যার চোখ আছে, তার জন্য নয়; এ কজ্জল তার, যার চোখ নাই—এ সংসারে কেউ নাই। যাও, যদি তোমার কজ্জলকে চাও, আবার অন্ধ হ’তে চেষ্টা করগে।

[সঙ্কর্ষণ ললাটে করাঘাত করিতে করিতে চলিয়া গেল]

কজ্জল। তোমার কিছু প্রার্থনা আছে অন্ধ?

জহ্নু। কিছু না। যেমন আছি, যেন ঠিক এই রকমই থাকি; তুমি আর আমার হাত ছেড়ো না।

কজ্জল। না, ওতে তোমার ঠিক পুরস্কার হবে না। [জহ্নুর চক্ষে হস্তার্পণে] হ’ক্ তোমার চক্ষু; দেখ আমার রূপ। [স্বরূপ বিকাশ করিলেন]

জহ্নু। [স্বীয় চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া অনিমেষ-নয়নে নারায়ণমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে বলিলেন] রূপ! রূপ! হাঁ রূপ বটে। রংটী জলভরা মেঘ, মুখখানি নিটোল, ঠোঁট দুখানি টুক্‌টুকে, ভ্রূ দুটী টানা টানা, চোখ দুটী ভাসা ভাসা, হাসিটী মধুর, রূপ বটে! কিন্তু—কিন্তু, বুঝি ততটা নয়,—তোমার রূপ ততটা নয়, যতটা রূপ তোমার দয়ার। নারায়ণ! নারায়ণ! প্রণাম করি। তোমার ও রূপের পায়ে নয়, প্রণাম করি তোমার দয়ার পায়। [ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম এবং নারায়ণের অন্তর্দ্ধান।]

জহ্নু। [উদ্‌ভ্রান্তের মত চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণে]
কৈ—কৈ ! কোথা গেলে জ্যোতির্ম্ময় ?
সজল জলদকান্তি কই তুমি সখা ?
দেখা দাও—দেখা দাও দেব।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষতল।

পীড়িত অবস্থায় তরলা বৃক্ষতলে ছিল।

তরলা। [আপন মনে বলিল] আরম্ভ হয়েছে ; ঠিক হয়েছে। তা' না হবে কেন ? চন্দ্র যতই সৌন্দর্য্য নিয়ে উঠুক না, তার সে কলঙ্কটুকু যায় না ; আর এতখানি পাপ ঢাকা যায় ? স্বামীকে অন্ধ করে, সতীত্বের বলিদান ! ওঃ, ঠিক হয়েছে। এই তো চাই ! এই মহাপাপের পরিণাম। বিচারক ! আরও কঠিন দণ্ড দাও, যন্ত্রণার শূল তৈরি কর। একটী আবেদন—আমার হৃদয়ের আগুন নিবিয়ে দাও প্রভু ! সে যে সকল যন্ত্রণা হ'তে মাথা ফুঁড়ে উঠ্‌ছে।

সঙ্কর্ষণ উপস্থিত হইল।

সঙ্কর্ষণ। তরলা ! কুটীরে চল।

তরলা। আবার কুটীরে ? না, আমার স্থান এই তরুতল—আমার শয্যা এই কণ্টকভূমি—আমার শুশ্রূষা বিষের প্রলেপ।

সঙ্কর্ষণ। কেন, তরলা! আর অনুতাপ কিসের? আমি তো তোমায় ক্ষমা করেছি।

তরল.। ক্ষমা—ক্ষমা! না স্বামি! ও তোমার ক্ষমা নয়, আজ তোমার ক্ষমা তরলার বুকে উচ্চ দণ্ডের মত বাজ্ছে। জগতের যত ক্ষমা সব যেন ধিক্কার, সব যেন প্রতিহিংসার এক একটা শিখা। তুমি ক্ষমা করেছ বটে, কিন্তু দেখ্তে পাচ্ছ স্বামী, এই ঘৃণ্য শীর্ণ মূর্ত্তি—এই অনুতাপ দগ্ধ বুক—সে ক্ষমা করেছে কৈ? তা' কি করে? তার চক্র যে সংসারের দয়া-দাক্ষিণ্য শূন্য, ক্ষমাহীন মমতাহীন, সে নিয়মিত পথে অহরহ চল্ছে; তার দারুণ বেগের পথে যে পড়্বে, অন্ধ—আতুর—পাপ—পুণ্য,—যেই হ'ক্—যত লৌহবর্ম্মেই আবৃত থাক্, পেষা যাবে। আমি আজ স্বামীর দয়া পেয়েছি ব'লে, তার চক্র কক্ষপথ ছেড়ে চল্বে কেন স্বামি? ওঃ—আর দাঁড়াতে পারি না। [ভূমিতে পড়িয়া গেল, তাহার মস্তক সঙ্কর্ষণের পায়ে লুটাইতে লাগিল]

সঙ্কর্ষণ। হা হতভাগিনি! এত ক'রেও তোর এ পাপ ক্ষালন হ'লো না। [তরলার মস্তক নিজের জানুদেশে রক্ষা করিয়া বসিলেন]

তরলা। না, তা' হয় না। যতই প্রায়শ্চিত্ত করুক, এ পাপের বুঝি ক্ষালন নাই। ওঃ, বড় পিপাসা, একটু জল দাও। তোমার দেওয়া জল পানে পবিত্র হই।

সঙ্কর্ষণ। [অর্দ্ধ স্বগতভাবে বলিল] তাই তো এখানে জল কোথা পাই?

সাধকবেশে কমণ্ডলুহস্তে পুরুমীর আগমন করিলেন।

পুরুমীর। তারা—তারা—তারা!

সঙ্কর্ষণ। সাধু! সাধু! তোমার কমণ্ডলুতে জল আছে?

পুরুমীর। কেন ?

সঙ্কর্ষণ। আমার রুগ্না স্ত্রীর মুখে দেবো।

পুরুমীর। ধর। [সঙ্কর্ষণকে কমণ্ডলু দিলেন, পরে তরলাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং আপন মনে বলিলেন] তাই তো! কে এ ?

সঙ্কর্ষণ। নাও তরলা! জল খাও।

তরলা। [তরলার দৃষ্টি পুরুমীরের দিকে পড়িল ; সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিল] না, আর খাবো না, আমার পিপাসা মিটে গেছে।

পুরুমীর। [এইবার পুরুমীর তরলাকে চিনিলেন ও বলিলেন] কেন নারি! পিপাসা মিট্‌লো কিসে ? আমায় দেখে ? ওঃ, এখনও তোমার স্পর্দ্ধা ? এখনও তোমার ঘৃণা ? মহাশয্যায় শুয়েও ভেদ ? চেয়ে দেখ নারি! আমি আর সে মুর্ত্তিতে নাই।

তরলা। এখানে কেন ?

পুরুমীর। তোমায় দেখ্‌তে, আমায় দেখাতে। আর যে মহাপাপে তোমার আজ এই দুরবস্থা, তা' আমারই কৃত,—তাই অম্লানে তার অংশ নিতে। দাও নারী, আমি শির পেতে বহন কর্‌বো—যদি তুমি তা'তে যন্ত্রণামুক্ত হও।

তরলা। যাও। আমি এত দুর্ব্বল নই—এত অক্ষম নই—এত জ্ঞানহীনা নই, যন্ত্রণার অংশ নিতে ডাক্‌বো তোমায়! তোমায় ডেকে-ছিলাম—যে দিন আমার সুখের পূর্ণ জোয়ার ; আজ আমার দুঃখের চরম দশা, এখন তোমায় ডাক্‌তে গেলুম কেন ? চেয়ে দেখ, আমার মাথার কাছে আমার ক্ষমাময় স্বামী। যাও—যাও, তুমি পায়ের কাছ হ'তে স'রে যাও,— আমার যন্ত্রণা বাড়্‌ছে।

ভগবদ্ভাবে তদ্গতচিত্ত চৈতন্য বাহু তুলিয়া হরিবোল—
হরিবোল বলিতে বলিতে উপস্থিত হইল।

চৈতন্য। বল তরলা! হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

তরলা। কে ও অমৃতকণ্ঠ?

চৈতন্য। বল তরলা! হরিবোল।

তরলা। চৈতন্য?

চৈতন্য। বল তরলা! হরিবোল।

তরলা। তুমি এখানে কি ক'রে চৈতন্য?

চৈতন্য। একদিন তুমি আমায় এই মন্ত্র দিয়েছিলে, আজ আমি তোমায় এই মহামন্ত্র দিতে এসেছি। বল তরলা! হরিবোল।

তরলা। তুমি ও মন্ত্রে সিদ্ধ হয়েছো চৈতন্য?

চৈতন্য। সিদ্ধি অসিদ্ধি বুঝি না, ওর ফলাফল মানি না; চোখের জল ফেলে মন্ত্র জপ্‌তে শিখেছি, এই পর্য্যন্ত। জপ তরলা! তুমিও একবার এই মহামন্ত্র জপ। চোখের জল ফেলে জপ, সকল অনুতাপ দূরে দিয়ে জপ; গুরু শিষ্য ভুল হ'য়ে যাক্। বল তরলা! হরিবোল।

তরলা। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

চৈতন্য। না, এতেও বুঝি শোধ হ'লো না। তুমি আমার যে উপকার ক'রেছ, তার প্রত্যুপকার বুঝি জগতে সৃষ্টি হয় নাই। তবু এস, খানিক তোমার শুশ্রূষা করি। [তরলার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল, চৈতন্যের করস্পর্শে তরলা আরোগ্য হইল ও তাহার পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিল।]

তরলা। [নিজের দেহ দেখিতে দেখিতে সবিস্ময়ে বলিল] একি! একি! আরতো আমার কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই, আর কোন ব্যাধি নেই।

[গাত্রোত্থান করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বলিল] একি ! একি চৈতন্য ! তোমার হাতে কি ?

চৈতন্য। মনে নাই—তুমি আমায় শ্যামসুন্দরের চাকরি করতে পাঠিয়েছিলে ? সেই চাকরি ক'রে পাওনা থোওনা দালান কোটার ভাগ্যে যাই হ'ক্, আমার হাত দু-খানা ঐ রকম হ'য়ে গেছে। তা, চল্লুম,—বেলা হচ্ছে—পরের চাকরি।

[গমনোদ্যত হইল]

পুরুমীর। চৈতন্য ! চৈতন্য ! কোথা যাবি ভাই ?

চৈতন্য। কে, রাজা ! যাবো শ্যামসুন্দরের মহলে। তুমি কোথা ?

পুরুমীর। আমিও যাবো মায়ের রাজ্যে।

চৈতন্য। বেশ চল। এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্, একই পথ।

[চৈতন্য ও পুরুমীর প্রস্থান করিল]

তরলা। চল স্বামি ! আমরাও পথ ধরি।

সঙ্কর্ষণ। এরা কারা তরলা ?

তরলা। এরা ছিল হিরণ্যকশিপু হিরণাক্ষ্য ; আজ জয় বিজয়।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। আজি জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন,
জহ্নু—জহ্নু !

এইবার নিজে আমি করিব পরীক্ষা
ত্যাগ ধর্ম্ম তব।
চক্ষু উৎপাটন করি করেছ প্রদান—
কিন্তু আজিকার এই পরীক্ষায়
কৃতকার্য্য হতে পার যদি,
বুঝিব তাহ'লে ভারতের ব্রহ্মচারী
ত্যাগে তুমি নমস্য গঙ্গার।
কোথা সহচরীগণ,
এস সবে উন্মত্ত প্রবাহে
প্লাবিত করিব আজ জহ্নুর আশ্রম।

[প্রস্থানোদ্যতা]

সহসা মহাদেবের আবির্ভাব।

মহাদেব। ফেরো গঙ্গা, ফেরো—

গঙ্গা। গঙ্গাধর।

মহাদেব। আত্মনাশের সঙ্কল্প নিয়ে এ তুমি কোথায় চলেছ অভিমানিনী?

গঙ্গা। অভিমানিনী! গঙ্গেশ! তোমার গঙ্গা আজ সত্যই মরতে চায়।

মহাদেব। কেন গঙ্গা! তোমার সর্ব্বস্ব গেছে বলে? জগৎ হতে তোমার শক্তি মাহাত্ম্য লুপ্ত হয়েছে বলে? তাতে কি? জানতো গঙ্গা! জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বড় চমৎকার। জগৎ হতে আমি একটু স্বতন্ত্র! চেয়ে দেখ এই চিতাভস্ম, চেয়ে দেখ এই অস্থিমালা, চেয়ে দেখ এই কণ্ঠে বিষের চিহ্ন। জগৎ যাদের ভীষণ অস্পৃশ্য বলে পায়ে ঠেলে দেয়, আমি তাদের সুন্দর সুস্পর্শ বলে আদরে বুকে

জড়িয়ে ধরি। বুঝে দেখ দেবী, আজ যদি তুমি জগতের কাছে হীন—আবিল অপবিত্র হও—ক্ষতি কি? শঙ্করের কাছে তুমি আরও আদরের—আরও উজ্জ্বল—আরও মহিমময়ী।

গঙ্গা। এই জন্যই তো আমি মরতে চাই। আমি জানি, সতীর শবদেহ শিবের স্কন্ধে যতটা যত্ন পেয়েছিল, জীবন্তে বোধ হয় ততখানি সৌভাগ্য তার হয় নাই।

মহাদেব। গঙ্গা—গঙ্গা!

গঙ্গা। শোন গঙ্গেশ! জহ্নুর সঙ্গে আজ আমার সংঘর্ষ; আমার নিজের মাহাত্ম্য ফিরে পাবার জন্য নয়, তোমার জহ্নুরই মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। তাই আজ সর্ব্বশক্তি নিয়ে তাকে পরীক্ষায় সম্মুখীন করছি। উদ্দেশ্য—পরীক্ষায় জয়ী হলে তাকে আশীর্ব্বাদ করবো—অন্য কিছু নয়।

[প্রস্থান]

মহাদেব। [কিয়ৎক্ষণ গঙ্গার গমন পথ প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া] চমৎকার! পরের জন্য বুক দিয়ে যুদ্ধ করে—প্রলয় তাণ্ডবে নাচে—কর্ত্তব্যে ক্ষিপ্রহস্তা—স্বার্থে উদাসিনী—বাঃ সুন্দরী বাঃ! তা না হলেই বা তোমার স্থান আমার মাথায় কেন?

[ধীরে ধীরে প্রস্থান]

জহ্নুর শিষ্যগণের প্রবেশ।

১ম শিষ্য। ওরে বাবা, একি প্লাবন রে! এযে চাল চুলো টিকি নামাবলী সব ভেসে গেল।

২য় শিষ্য। ওরে আমার যে কোশাকুশী কুশাসন—

৩য় শিষ্য। ওরে, আমার কাপড় চোপড় কিছু সামলাতে পাল্লুম না যে রে বাবা।

১ম শিষ্য। ওরে ভাই! এখনও জল আস্‌ছে যে রে।

২য় শিষ্য। এঁ্যা, তাইতো—দেখতে দেখতে জল যে থই থই ক'রে উঠলো।

১ম শিষ্য। সর্ব্বনাশ!

২য় শিষ্য। মাথায় পা।

৩য় শিষ্য। আরে দাঁড়াই কোথা ঠাকুর?

সকলে। [সভয়ে সমবেত কণ্ঠে] রক্ষা কর—রক্ষা কর—

দ্রুতপদে জহ্নুর প্রবেশ।

জহ্নু। ভয় নাই, ভয় নাই! একি! গঙ্গা! গঙ্গা! এ আবার কি! জহ্নুর আশ্রমে প্লাবন! বুঝেছি—এ আবার তার আর এক স্পর্দ্ধা। সাবধান গঙ্গা! জহ্নুরও ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।

গঙ্গার আবির্ভাব।

গঙ্গা। সীমার বাঁধ কাটিয়ে ওঠ ব্রহ্মচারী! আজ তোমার সঙ্গে আমার শক্তির পরীক্ষা।

সকলে। রক্ষা কর—রক্ষা কর।

জহ্নু। রক্ষা! রক্ষা! কেমনে করিব রক্ষা?
ত্যাগ ব্রত অনুষ্ঠানে ব্রতী আমি,
হলে ধৈর্য্যচ্যুতি
অসম্পূর্ণ হবে ব্রত!
গঙ্গা! গঙ্গা! দাসী তুমি মম—
করিয়াছ অঙ্গীকার
পালিবে আমার আজ্ঞা
সদা নির্ব্বিচারে।

করিগো মিনতি—
কৃপা করি কর সম্বরণ,
প্লাবন মুরতি তব।

গঙ্গা। না—না!

জহ্নু। না! শুনিবে না কোনও কথা?
কাতর মিনতি মোর রবে উপেক্ষিত?
পাশরিবে সকল মাহাত্ম্য তব?
অবসর বুঝি এবে
হীন প্রতিহিংসাব্রত
চরিতার্থ করিবারে চাহ?

গঙ্গা। হা—হা—হা—
কোথায় মাহাত্ম্য মোর?
আমার মাহাত্ম্য যত তোমাতে অর্পিত,
আমি কোথা পাব?
মোর পাশে বিন্দুমাত্র
করিও না আশা।

জহ্নু। গঙ্গা! গঙ্গা! করি অনুরোধ—

গঙ্গা। বুঝিয়াছি শক্তি তব,
হে বীরপুরুষ—
মম শক্তি বলে বলীয়ান হয়ে
যত তব জারি জুরি।
আজি ভাঙ্গিব সে মোহ
চূর্ণিব তোমার দর্প।

বিদ্রোহিনী আমি,—
পার যদি—আত্মরক্ষা কর

[অন্তর্দ্ধান]

জহ্নু। আরে রে গর্ব্বিতা বামা!
ঋষি-বাক্যে বার বার কর অবহেলা!
কিসের মত্ততা এত?
ধর্ যোগ্য প্রতিফল তার।
ত্রিভুবনে আছে যত বারি রাশি তব,
সংক্ষেপ করিয়া তায়,
এই আমি গণ্ডুষে করিনু পান,
হও অপসৃত—

[গণ্ডুষে গঙ্গাকে পান করিলেন, গঙ্গা অদৃশ্য হইলেন]

জহ্নু। [বিকট হাস্য সহকারে] হা হা হা!
কোথা গঙ্গা! কই গঙ্গা!
কোথা সে তরঙ্গ ভঙ্গ?
কোথা গেল তাণ্ডব নর্ত্তন?

১ম শিষ্য। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করলে?

[শিষ্যগণ পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল]

২য় শিষ্য। ধন্য প্রতাপ! ধন্য যোগবল!

বৈদিক। সর্ব্বনাশ! গঙ্গার সঙ্গে সংসারের সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম লুপ্ত হলো যে! [সভয়ে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল]

জহ্নু। কি—কি—কি বলিলে?

বৈদিক। [পূর্ব্ববৎ বলিলেন] গঙ্গার সঙ্গে সংসারের সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম লুপ্ত হলো—সর্ব্বনাশ হলো।

জহ্নু। সত্য—সত্য—একি হলো আজ ?
জিঘাংসায় অন্ধ হয়ে
এ হেন অহিত আমি সাধিনু ধরার ?
যে গঙ্গা দিয়েছে দান,
সকল গরিমা তার
তৃণ জ্ঞানে অম্লানে আমারে,
তার এই সামান্য ঔদ্ধত্য
ক্ষমিতে নারিনু আমি—স্বার্থ বশীভূত।
পরাজিত—পরাজিত আমি।
ভ্রান্ত আমি,—ভেসে গেছি মহা ছলনায়।

সহসা ব্রহ্মার আবির্ভাব।

ব্রহ্মা। বুঝতে পেরেছ জহ্নু!
তুমি পরাজিত ?

জহ্নু। বুঝিয়াছি ; কিন্তু দেব, কি হইবে আর !
বোঝে জীব শ্মশান শয্যায়,
ফিরিতে যখন আর থাকে না উপায়।

ব্রহ্মা। এখনও উপায় আছে প্রাণাধিক ! মুক্তিময়ীকে মুক্তি দান কর ; তাহ'লেই তোমার ত্যাগ-ব্রতের স্বার্থকতা হবে।

জহ্নু। [আনন্দে বিহ্বল হইয়া]
হবে ? হবে ?
আবার ফিরিয়া পাবো আমার যা কিছু ?

ব্রহ্মা। পাবে।

জহ্নু। কহ দেব কি উপায় তবে—

ব্রহ্মা। [জহ্নুর কথায় বাধা দিয়া]
যে শক্তিতে করিয়াছ পান
সেই শক্তি বলে আবার কর উদ্গীরণ।

জহ্নু। ঠিক্ ঠিক্ তাই হবে, তাই হবে ধাতা,
ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে রক্ষণ
উদ্গীরণ করিব এখনি পুত-প্রবাহিনী!
না না, হবে না—হবে না,
উচ্ছিষ্ট হবে যে তায়
ত্রিলোক-পাবনী মাতা!
ধর্ম্ম কর্ম্ম তা হ'তে না হবে।

ব্রহ্মা। তবে—

জহ্নু। [বাধা দিয়া] হবে না বলিতে আর
বুঝিয়াছি কি আছে উপায়!
তাই হবে—তাই হবে,
নিজ অঙ্গ নখে বিদারিয়া
আনিব ধরায় পুনঃ মহিমময়ীরে।

[নখাঘাতে স্বীয় জানুদেশ বিদীর্ণ করিতে
করিতে বলিলেন]

এস গঙ্গে! এস মা মুকতিময়ী!
বিষ্ণু পাদোদ্ভূতা মহা জলেশ্বরী,
সকল মাহাত্ম্য ল'য়ে হইয়া জাগ্রতা—
আবার বহিয়া যাও এ বিশ্বমণ্ডলে।

[জানুদেশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন, ধীরে ধীরে গঙ্গা
আবির্ভূতা হইলেন, অন্তরীক্ষ হ'তে দেবতাগণ
জহ্নুর মস্তকে পুষ্প বর্ষণ
করিতে লাগিলেন]

ব্রহ্মা। ধন্য—ধন্য তুমি জহ্নু! সকল প্রতিহিংসা ভুলে, স্বীয় অঙ্গ বিদীর্ণ ক'রে, গঙ্গায় মুক্তি দান করলে! তোমার এ আত্ম-ত্যাগের তুলনা নাই! তোমার এ কীর্ত্তি আপ্রলয় অক্ষয় থাকবে।

মহাদেবের আবির্ভাব।

মহাদেব। শিবত্ব প্রাপ্ত হও জহ্নু! অন্য বর তোমার যোগ্য নয়।

কজ্জলের নারায়ণ মূর্ত্তিতে আবির্ভাব।

কজ্জল। দেখ জহ্নু! এবার আর তোমার হাত আমি ছাড়বো না।

জহ্নু। গুরু! নারায়ণ। [যথাযথ সকলকে প্রণাম করিয়া, শেষে গঙ্গার পদতলে বসিয়া] মা! মা! মহিমময়ী! তোমার মহিমা জগতে ধারণাতীত! কলুষ-নাশিনী! আজ আমার হৃদয়ের সমস্ত কলুষ হরণ ক'রে, আমায় তুমি মুক্ত করলে।

গঙ্গা। তা নয় জহ্নু! তোমার স্পর্শ লাভ ক'রে আজ আমিও ধন্য! আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে বলছি, হে ভারতের ব্রহ্মচারী, তোমার স্থান নারায়ণের সহিত একাসনে। আজ তুমি পিতা—আমি তোমার অঙ্গজাত কন্যা। **'তুমি জহ্নু—আমি জাহ্নবী'।**

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক

রাখীবন্ধন

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় কৃত ঐতিহাসিক নাটক, বীণাপাণি নাট্যসম্প্রদায়ে অভিনীত। সেই ভারত-গৌরব মেবারের বীরত্ব কাহিনী। চিড়িমার পুত্র মন্নুলালের সহিত রাজ পুত্রী লক্ষ্মীরবিবাহ, বিলাসী রাণার ঔদাসীন্যে মালবাধিপতি বাহাদুর সার মেবার আক্রমণ, মেবারের বিরুদ্ধে মন্নুলালের যুদ্ধ, সূর্য্যমলের কূট অভিসন্ধি, সা-সুজার বিশ্বাসঘাতকতা, ছগনলালের স্বদেশপ্রীতি, হুমায়ূনের নিকট কর্ণদেবীর রাখী প্রেরণ প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

ভাণ্ডারী-অপেরার শ্রেষ্ঠ অভিনয়। সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাকুল উন্মাদনা —মাতৃহারা লব-কুশের হাহাকার—ছায়া-সীতার আকুল আহ্বান—মহাকালের তাণ্ডব নর্ত্তন—ষড়রিপুর সহিত পৃথিবীর যুদ্ধ—শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণবর্জ্জন—ঊর্ম্মিলার সকরুণ বিলাপ —গুহক চণ্ডালের দুর্জ্জয় অভিমান—লক্ষ্মণের সরযূ প্রয়াণ প্রভৃতি। সহজে অভিনয় হয়। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

বরাহরূপী নারায়ণের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকের উৎপত্তি, শিশিরায়ণ ও শঙ্খনাদের অদ্ভুত আত্মত্যাগ, কৌশলে দৈত্যরাজকুমারী স্বর্গের সহিত নরকের বিবাহ, নরক কর্তৃক ষোড়শ সহস্র কুমারী হরণ, বিশ্বকর্ম্মার বন্দীত্ব ও দুর্গনির্ম্মাণ, সত্যভামারূপে পৃথিবীর জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরকের যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়, কৌশলে পৃথিবীর নিকট নরকধ্বংসের সম্মতিলাভ, নরকাসুরের মৃত্যু, স্বর্গের সহমরণ প্রভৃতি ঘটনার সমাবেশ। মূল্য ১॥০ টাকা।

দুষ্মন্ত-কীর্ত্তি

শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত হইতেছে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সেই চির-মধুর কাহিনী। ইহাতেই সেই কালকেয় দৈত্য, প্রসেন, ভবানন্দ, দুর্ব্বাসা, রত্নেশ্বর, মাধব্য, হংসবতী, অমিয়া, সুদর্শন, উর্ব্বশী ও মেনকা প্রভৃতি সবই আছে। নাচে গানে ধুল পরিমাণ। মূল্য ১॥০ টাকা।